দারসে কুরআন সিরিজ-১০

মি'রাজের তাৎপর্য

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

দারসে কুরআন সিরিজ-১০

মি'রাজের তাৎপর্য

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠকবন্ধু মার্কেট,
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
মোবাইল : ০১৭১১-৯৬৬২২৯, ০১৯২৪-৭৩৩৮১৫

www.pathagar.com

মি'রাজের তাৎপর্য

খন্দকার আবুল খায়ের (র)

প্রকাশক

খন্দকার মঞ্জুরুল কাদির

খন্দকার প্রকাশনী

পাঠকবন্ধু মার্কেট

৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

প্রকাশকাল

প্রথম সংস্করণ ঃ আগস্ট - ১৯৮৫ ইং

সাতাইশতম প্রকাশ ঃ জানুয়ারি - ২০১৬ ইং

প্রচ্ছদ

আনোয়ার হোসেন খান

মুদ্রণ

আল-আকাবা প্রিন্টার্স

৩৬, শ্রীশ দাস লেন, বাংলাবাজার

মূল্য ঃ ৪০ টাকা

www.pathagar.com

সূচীক্রম

মি'রাজের তাৎপর্য	০৫
মি'রাজ	০৬
মি'রাজ কি ও কেন?	০৭
আনুষাঙ্গিক আলোচ্য বিষয়	০৮
চিন্তার বিষয়	১৪
ট্রেনিং-এর যৌক্তিকতা	১৫
মিরাজের দিন তারিখ ও পথের কাহিনী	১৬
মিরাজ উর্ধ্বলোকে কেন?	২২
কত সময়ে নবী (স) মিরাজে গেলেন	২৪
বোর্রাক কি ও আরশে মুয়াল্লা কতদূর?	২৪
বিদ্যুতে সওয়ার হওয়া কি সম্ভব?	২৬
মি'রাজ স্বশরীরে, কি স্বপ্নে?	২৭
মিরাজ স্বশরীরে কি সম্ভব?	২৭
পৃথিবীর এক মুহূর্তে আরশে ২ যুগ-একি সম্ভব?	২৮
সময় বন্ধ করলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়?	৩০
মি'রাজে গিয়ে কি নবী (স) আল্লাহকে দেখেছিলেন এবং তা কি সম্ভব?	৩১
শেষ বিচারের পূর্বে দোযখে লোক দেখা কি সম্ভব?	৩৩
মি'রাজের প্রকৃত শিক্ষা	৩৪
শান্তি প্রতিষ্ঠার ১৪ দফা মূলনীতি	৩৫
তিনি যা দেখলেন	৪৩
উপসংহার	৪৬

www.pathagar.com

দারসে কুরআন তাদের জন্য

- যারা কুরআনী জ্ঞান লাভ করতে চান।
- যারা তাফসীর পড়ার সময় পান না।
- যারা বড় বড় তাফসীর পড়তে ধৈর্য হারিয়ে ফেলেন।
- যারা আরবী না জানলেও কুরআন বুঝতে আগ্রহী।
- যারা তাফসীর মাহফিলে হাজির হওয়ার সুযোগ পান না।
- যারা ইমাম, খতীব ও মুবাল্লিগ এবং যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য উপস্থাপনে আগ্রহী।

এ সিরিজের বৈশিষ্ট্য ঃ

- ছোট ছোট আকারে সংক্ষিপ্ত পুস্তিকা।
- সরল অনুবাদ ও শব্দে শব্দে ব্যাখ্যা।
- সহজবোধ্য ভাষায় আকর্ষণীয় যুক্তি।

এ প্রয়াসের লক্ষ্য ঃ

- দেশব্যাপী কুরআনী জ্ঞানের বিস্তার ঘটানো।
- লক্ষ কোটি শার্দুলদের আরেকবার জাগিয়ে তোলা।

www.pathagar.com

মি'রাজের তাৎপর্য

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

سُبْحٰنَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلًا مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصَا الَّذِىْ بٰرَكْنَا حَوْلَهٗ لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ط اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ * (بنى إسرائيل)

অনুবাদ ঃ পরম দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে।

পরম পবিত্র ও মহিমাময় সত্তা যিনি তাঁর স্বীয় বান্দাকে এক রাত্রে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত ভ্রমণ করালেন– যার চতুর্দিকে আমার রহমত ঘিরে রেখেছিল– যেন আমি তাকে কুদরতের কিছু নিদর্শন দেখিয়ে দেই। তিনিই সব কিছু শোনেন ও দেখেন।

سُبْحَانْ থেকে এমন পবিত্রতা বুঝায় যার মধ্যে যে কোন বিষয়ের না পারার মত কোন অযোগ্যতা নেই। অর্থাৎ যিনি সকল প্রকার অপরাগতার উর্ধ্বে- যার কাছে অসম্ভব বলে কোন জিনিস নেই।

اَلَّذِىْ যিনি, اَسْرٰى ভ্রমণ করালেন, بِعَبْدِهٖ তাঁর বান্দাহকে। এখানে উল্লেখযোগ্য যে আত্মা ও দেহের সমষ্টিকেই বলা হয় عَبْدْ বা দাস। ভিন্ন কথায় عَبْدْ (আব্‌দ) তাকেই বলা হয় যিনি জীবিত এবং জাগ্রত। যদি স্বপ্নে দেখার কথা বলা হতো তা হলে সূরা ইউছুফে যেমন اِنِّىْ رَاَيْتُ বলা হয়েছে সেইরূপ এখানেও বলা হত। এছাড়াও যদি শুধু রুহকে নিয়ে যাওয়া হতো তা হ'লেও কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী نَفْسْ নাফস বলা হতো এবং এর সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত শব্দগুলিকে مُؤَنَّثْ (স্ত্রীলিঙ্গ) হিসাবে ব্যবহার করা হতো। কারণ نَفْسْ শব্দটি مُؤَنَّثْ। এসব কিছু যখন বলা হয়নি তখন জিন্দা এবং জাগ্রত অবস্থায় মি'রাজ হয়েছিল এইটাই প্রমাণিত হলো।

www.pathagar.com

لَيْلًا শব্দের পূর্বে যদি ال থাকত তা হ'লে পুরা একটা রাতের সফর বুঝাত কিন্তু যেহেতু لَيْلًا শব্দটাকে نَكِرَةٌ হিসাবে ব্যবহার করা হয়েছে তাই পুরা রাত না বুঝিয়ে রাতের একটা অংশকে বুঝানো হয়েছে।

উল্লেখিত আয়াতে মসজিদে হারাম থেকে মসজিদে আকসা পর্যন্ত সফরকে 'ইসরা' বলা হয়, (কোরআন শরীফের কোন কোন নোসখায় এই 'ইসরা' শব্দটাকেই এই সূরার নাম হিসাবে গ্রহণ করা হয়েছে।) এবং সেখান থেকে আসমান পর্যন্ত যে সফর তাকেই বলা হয়েছে মি'রাজ।

بَارَكْنَا حَوْلَهُ থেকে বুঝায় বায়তুল মোকাদ্দাসের আশ পাশ সিরিয়া প্রদেশ ধর্মীয় ও পার্থিব বরকতসমূহ দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল এবং তৎসহ অপার্থিব উর্ধ্বলোকের বায়তুল মামুর, যার পাশ্ববর্তী এলাকা এক অপার্থিব নেয়ামত দ্বারা পরিপূর্ণ ছিল। এ সব কিছুই দেখানোর উদ্দেশ্যে আল্লাহ তাঁর স্বীয় বান্দাকে তাঁর রহমতের সর্বাধিক সান্নিধ্যে নিয়ে গেলেন।

سَمِيعُ الْبَصِيرُ থেকে বুঝানো হয়েছে যে রাসূল (স)-এর মনে তখন যে কথা ছিল তা তিনি শুনতেছিলেন এবং তাঁর যা প্রয়োজন ছিল তা তিনি দেখতেছিলেন। বিস্তারিত ব্যাখ্যা পরে আসছে।

মি'রাজ

মি'রাজ ছিল নবী জীবনের এক মহা উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ কোন আকস্মিক ঘটনা ছিল না। এ ছিল নবী জীবনের মূল উদ্দেশ্যের সঙ্গে জড়িত এক পূর্ব পরিকল্পিত ও সময়োচিত ঘটনা। যে উদ্দেশ্যে নবী প্রেরণ, সেই উদ্দেশ্য সফলের জন্য যে মুহূর্তে প্রয়োজন হয়েছিল মি'রাজের ঠিক সেই মুহূর্তেই সংঘটিত হয়েছিল মি'রাজ। এর মূল তাৎপর্য ও শিক্ষা যদিও আমাদের প্রতিটি মুসলমানেরই জানা উচিৎ কিন্তু তা জানা আছে খুব কম লোকেরই। তা ছাড়া কিছু লোকের কুটিল ও জটিল বিতর্ক জালে তা ঢাকা পড়ে গেছে।

নবী (স)-এর দীর্ঘ ১২ বছরের চেষ্টার পর যখন ইসলামী মূল্যবোধ ও ইসলামী জীবনবোধের ভিত্তিতে একটা খেলাফতের ভিত্তি স্থাপনের সময় আসন্ন হয়ে আসছিল তখন নবী (স) মনে মনে উদগ্রীব ছিলেন সে

www.pathagar.com

খেলাফতির একটা নির্ভুল নক্শা পাওয়ার জন্যে। আর মনে মনে চাচ্ছিলেন এমন কিছু নির্দশন দেখতে যা দেখে পরকালের অবস্থাটা প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে তাঁর উম্মতের সামনে পেশ করতে পারেন। সেই মুহূর্তেই সংঘটিত হয়েছিল মি'রাজ। আল্লাহ পাক তাঁর প্রিয় নবীকে আরশে মুয়াল্লায় ডেকে নিয়ে তাঁর কুদরতের এমন কিছু নিদর্শন দেখালেন এবং এমন কিছু শিক্ষা দিলেন যার দ্বারা উপরোক্ত প্রয়োজনগুলো মিটতে পারে।

আমার নিশ্চিত বিশ্বাস যে– আমরা গোটা পৃথিবীর তামাম মানুষ যদি মি'রাজের মূল শিক্ষা কি-তা বুঝতাম এবং সেই মুতাবিক আমাদের সমাজ গড়তে পারতাম তাহলে অবশ্যই আমরা পৃথিবীর মানব গোষ্ঠী সত্যিকারের মনুষ্যত্বের পূর্ণ মর্যাদা সহকারে এ পৃথিবীতে বসবাস করতে পারতাম, আমাদের জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রেই পূর্ণ শান্তি ও স্থায়ী নিরাপত্তা কায়েম হ'ত এবং কারোই মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হতো না।

দুর্ভাগ্য আমাদের এখানে যে, আমাদের সামগ্রিক জীবনের কল্যাণ, শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তার গ্যারান্টি যুক্ত সঠিক ও নির্ভুল জীবন ব্যবস্থার পুরা নক্শা যা নবী (স) মি'রাজে গিয়ে আল্লাহর নিকট থেকে নিয়ে এসেছিলেন তা আমাদের হাতে থাকা সত্ত্বেও আমরা তার কোন খোঁজ খবর রাখিনা অথবা তার কোন গুরুত্বই দেই না। এই সম্পর্কীয় কিছু জরুরী খোঁজ খবর যা বিভিন্ন কারণে মুসলিম সমাজ (সাধারণ ভাবে সবাই) জানতে পারেনি তা জানানো এবং এ সম্পর্কে যেসব বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়ে রয়েছে তার অপনোদনই এ দারস এর মূল উদ্দেশ্য।

তাছাড়া এ সিরিজে দারসের সঙ্গে আনুসাঙ্গিক কিছু বিষয়ের উপরও আলোচনা করা হয়েছে।

মি'রাজ কি ও কেন?

আভিধানিক অর্থে– মি'রাজ মানে উত্থান বা উর্ধ্বেগমন। পারিভাষিক অর্থে- মি'রাজ বলতে আমরা বুঝি আল্লাহ পাক তার নবী রাসূলগণকে নবুয়্যাতের গুরুদায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তোলার জন্যে যে ট্রেনিং দেয়ার উদ্দেশ্যে তাঁর রহমতের সর্বাধিক সান্নিধ্যে ডেকে নিতেন, ঐ ডাকে হাজির হওয়াকেই মি'রাজ বলা হয়। যা পূর্বেও একবার বলা হয়েছে। এ মি'রাজ প্রায় প্রত্যেক নবী রাসূলগণেরই হয়েছিল। কিন্তু সবার মি'রাজ একই স্থানে এবং একই ধরনের হয়নি। যেমন হযরত আদম (আ)-এর

www.pathagar.com

মিরাজ হয়েছিল বেহেশতের মধ্যে, মুসা (আ)-এর তূর পাহাড়ে, ইব্রাহীম (আ)-এর মরুভূমির মধ্যে, আর আমাদের নবী (সা)-এর একেবারে সাত তবক আসমানের উপরে আরশে মুয়াল্লায়। আমাদের নবী (স) যেহেতু বিশ্বনবী ও শেষ নবী ছিলেন তাই তার দায়িত্বও ছিল সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ। এজন্যে তাঁর ট্রেনিংও ছিল সর্বাধিক দামী, তাই তা ছিল বিরাট লম্বা কোর্সের ও দীর্ঘ সময়ের, আর তাঁর স্থানও ছিল খোদ রাব্বুল আ'লামীনের রাজধানীতে।

আনুষাঙ্গিক আলোচ্য বিষয়

মানুষ সাধারণতঃ এই মি'রাজকে অবলম্বন করে কতকগুলো বিভ্রান্তিকর প্রশ্ন উত্থাপন করে থাকে। সেইসব প্রশ্নগুলোর বৈজ্ঞানিক সমাধান ও মি'রাজের মৌলিক শিক্ষাই এ দারসের মূল আলোচ্য বিষয় যা নিম্নোক্ত শিরোনামে আলোচনা করা হয়েছে। যথা–

১। মি'রাজের উদ্দেশ্য কি?

২। মি'রাজ উর্ধ্বলোকে কেন?

৩। বোর্রাক কি?

৪। মি'রাজ কি স্বশরীরে না স্বপ্নে?

৫। নবী (স) কি সেখানে গিয়ে আল্লাহকে দেখেছিলেন এবং দেখা কি সম্ভব?

৬। উর্ধ্বলোকের ২৬/২৭ বছর আর পৃথিবীর এক মুহূর্ত, এটি কি যুক্তিগ্রাহ্য?

৭। শেষ বিচারের পূর্বে দোযখে কি করে লোক দেখা গেল?

৮। মি'রাজের আসল শিক্ষা কি ছিল?

৯। নবী (স)-কে মি'রাজে নিয়ে আল্লাহ্ পাক কি কি দেখালেন?

১০। কেন তা দেখালেন?

নিম্নে এ প্রশ্নগুলোর সংক্ষিপ্ত জবাব দেয়া হলো।

মি'রাজের উদ্দেশ্য ও সংক্ষিপ্ত ব্যাখ্যা

আল্লাহ চান, তাঁর সৃষ্টির মধ্যে তাঁরই আইন চালু থাকুক এবং তাঁরই

www.pathagar.com

হুকুম ও বিধান মত মানুষ জীবন-যাপন করুক। তাঁর সৃষ্টির মধ্যে দুই প্রকার আইন চালু রয়েছে। (এক) তাকবীনি- যার মধ্যে কারও কোন ক্ষমতা প্রয়োগের অধিকার নেই। যেমন– দিবা-রাত্রি, অমাবস্যা-পূর্ণিমা, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি। (দুই) তাশরিয়ী-যার আইন আল্লাহ করে দিয়েছেন কিন্তু সে মুতাবিক চলা বা তার বিপরীত চলা উভয়টারই অধিকার আল্লাহ মানুষকে দিয়েছেন। এই সব আইন মেনে চলা না চলার উপরই নির্ভর করে তার পরকালের মুক্তি বা শাস্তি। এ ব্যাপারে আল্লাহর দায়িত্ব হচ্ছে মানুষকে পরিপূর্ণভাবে তার ইচ্ছা মুতাবিক চলা ও সেই মুতাবিক মানব সমাজকে দাঁড় করিয়ে দেয়ার ব্যবস্থা করা। এই উদ্দেশ্যেই আল্লাহ নবী পাঠাতেন। আর এই একই উদ্দেশ্যে নবী (স)-কে আল্লাহ এমন শিক্ষা দান করতে চাইলেন যেন সেই শিক্ষার আলোকে পৃথিবীর মানব গোষ্ঠিকে এমন একটা সমাজ ব্যবস্থার উপর দাঁড় করিয়ে দিতে পারেন যেন মানুষ তার গোটা জীবন দিয়ে আল্লাহরই ইচ্ছা পূরণ করতে পারে। এসব কথা বুঝার জন্যেই কালামে পাকে সূরা বনি ইসরাইলের উল্লেখিত প্রথম আয়াতের শেষাংশে মি'রাজের উদ্দেশ্য সম্পর্কে বলা হয়েছে ঃ

لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا ـ اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

'তাঁকে (ডেকে নিলাম) আমার নিদর্শনাবলীর কিছু দেখানোর উদ্দেশ্যে। তিনি সব কিছু শোনেন এবং সব কিছু দেখেন। এখানে লক্ষণীয় যে এই আয়াতের শেষে আল্লাহ কেন বললেন যে তিনি শোনেন এবং দেখেন। এ বলার কারণ একমাত্র এই হতে পারে যে নিকট ভবিষ্যতে ঈমান আকীদা ও পরকালের জবাবদিহির ভিত্তিতে যে সমাজ গড়ার সময় আসছিল তার একটা কাঠামো কিরূপ হবে, তা যেন নবী (স) জানতে চাচ্ছিলেন, আর যেন মনে মনে বলছিলেন যে আল্লাহ আমি তোমার কুদরতের কিছু নিদর্শন অর্থাৎ বেহেশত দোযখ সহ কিছু অপার্থিব বিষয়বস্তু দেখতে চাই। হুজুরে পাক নবীর (স)-এর মনের এ কথা দু'টির জবাবেই যেন আল্লাহ বলেছেন–

اِنَّهٗ هُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ ـ

তিনি শুনেছেন তোমার মনের কথা ও দেখছেন তোমার কি প্রয়োজন তা এবং কি জন্যে ডেকে নিলেন, তারই জবাবে আল্লাহ বলছেন لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا আমার কুদরতের নিদর্শন দেখানোর উদ্দেশ্যে ডেকে নিলাম। যেমন

www.pathagar.com

তা দেখে একটা প্রত্যক্ষ জ্ঞান সৃষ্টি হতে পারে এইটাই ছিল মি'রাজের আসল উদ্দেশ্য। সেখানে নিয়ে এমন কিছু দেখালেন এবং এমন কিছু জিনিস শিখালেন যার সাহায্যে নবী জীবনের আসল উদ্দেশ্য সফল হতে পারে।

নবী জীবনের আসল উদ্দেশ্যকে সংক্ষেপে এক কথায় বলা চলে।

وَمَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ ـ

অর্থাৎ "আমি আপনাকে একমাত্র বিশ্ব জাহানের রহমত স্বরূপ পাঠিয়েছি।" এ রহমতের অর্থই হচ্ছে পৃথিবীর লোকদেরকে ইহকালীন ও পরকালীন অশান্তির হাত থেকে উদ্ধার করে চিরশান্তির আওতায় এনে দেয়া। এ জন্যে প্রয়োজন ছিল মানব রচিত ভুল জীবন ব্যবস্থা থেকে সমাজের মোড় ফিরিয়ে আল্লাহর দেয়া জীবন ব্যবস্থার উপর মানব সমাজকে দাঁড় করিয়ে দেয়া। এই কথাকেই আল্লাহ পাক এভাবে বলেছেন–

هُوَ الَّذِىْٓ اَرْسَلَ رَسُوْلَهٗ بِالْهُدٰى وَدِيْنِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهٗ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهٖ وَلَوْكَرِهَ الْمُشْرِكُوْنَ ـ

তিনি তাঁর রাসূলকে পথ নির্দেশিকা ও সত্য জীবন ব্যবস্থা বা কুরআন পাক দিয়ে এই জন্যে পাঠিয়েছেন যেন তিনি সকল প্রকার মানব রচিত ভুল জীবন ব্যবস্থার ওপর খাঁটি জীবন ব্যবস্থাকে (যা আল্লাহর দেয়া, যার মধ্যে অনাবিল শান্তি রয়েছে তা) বিজয়ী করে দিতে পারেন। যদিও মুশরিকরা তা পছন্দ করবে না। ঐ একই ব্যাপারে অন্য আয়াতে বলা হয়েছে–

وَلَوْكَرِهَ الْكَافِرُوْنَ "যদিও তা কাফেররা পছন্দ করবে না।" অর্থাৎ কাফের এবং মুশরিকরা যে ইসলামী হুকুমত চাইবে না, তা পছন্দ করবেন না এবং ইসলামী হুকুমত কায়েম করতে গেলে তারা তার বিরোধিতা করবে, আল্লাহ পাক পূর্বেই তা বলে দিলেন। এখানে জানা উচিৎ যে মুশরিক বলতে কাদের বুঝানো হয়েছে এবং কাফেরই বা কোন শ্রেণীর লোক। নবী (স)-এর সঙ্গে যারা বিরোধিতা করেছিল তারা আল্লাহকে মানতো। আবু জেহেলও বদরের যুদ্ধে যাওয়ার সময় কা'বা শরীফের গেলাফ ধরে আল্লাহর নিকট প্রার্থনা করেছিল যে আল্লাহ আমি যেন মুহাম্মদ-এর সঙ্গে যুদ্ধ করে জয়লাভ করতে পারি। এর থেকে বুঝা গেল যে, আবু জেহেলও আল্লাহকে মানতো।

www.pathagar.com

এইবার শুনুন মুশরিক কারা। শিরক্ যারা করে তারাই মুশরিক। এ শিরক তিন প্রকার। যথাঃ-

১. اَلشِّرْكُ بِالنَّفْسِ (আশশিরক বিন্ নাফ্স) নিজের মনকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দের উপর নিজের পছন্দকে স্থান দেয়া। যেমন আল্লাহর পছন্দ হলো মানুষ সুদী কারবার করবে না মানুষ পছন্দ করল, সুদী কারবার ছাড়া সমাজ চলবে না। এভাবে আল্লাহর ইচ্ছার উর্ধ্বে মানুষের ইচ্ছার স্থান দেওয়াও এক প্রকার শিরক।

২. اَلشِّرْكُ بِالذَّاتِ (আশ শিরক বিয্যাত) আল্লাহর যাতের সঙ্গে শরীক করা অর্থাৎ মূর্তি পূজা করা, হযরত ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহর বেটা মনে করা ইত্যাদি।

৩. اَلشِّرْكُ بِالصِّفَاتِ (আশ শিরক বিস সিফাত) আল্লাহর গুণের সঙ্গে আর কিছুকে শরীক করা অর্থাৎ যে সব গুণ আল্লাহ ছাড়া আর অন্য কিছুতে নাই তা অন্য কিছুর মধ্যে আছে বলে মনে করা। যেমন কিছু মানুষ মনে করে আল্লাহর কাছ থেকে যে উপকার পাওয়া যাবে তার সমান উপকার পাওয়া যাবে খাজা বাবার মাজার থেকে বা অন্য কোথাও থেকে। কারও বিশ্বাস তুলসি গাছও খোদার অংশ বিশেষ ইত্যাদি। এগুলো হচ্ছে আল্লাহর গুণের সঙ্গে শরীক করা। এর যে কোন প্রকার শিরক যারা করে তারা মুশরিক। আর কাফের হচ্ছে তারাই যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করলেও তাঁর ক্ষমতা, তাঁর অধিকার, তাঁর আইন-কুনুন ইত্যাদি মানে না। তাই আল্লাহ পাক পূর্বেই বলেছিলেন যে কাফের মুশরিকরা চাইবে না যে খোদায়ী জীবন ব্যবস্থা সমাজে পুরোপুরি কায়েম হোক। শেষ পর্যন্ত ঘটলও তাই। কাফের মুশরিকরা ভীষণভাবে বিরোধিতা করল। নবী (স) তা প্রতিরোধ করলেন। এজন্যে হুজুরে পাক (স)-কে জীবন মরণ জিহাদ করতে হলো। জিহাদ করার জন্যে আল্লাহ কড়া হুকুম নাযিল করলেন। শুধু মাত্র জিহাদের উদ্দেশ্যে নাযিল হলো সূরা আহযাব সূরা আনফাল, সূরা তাওবা ও আরও অন্যান্য সূরার মধ্যে কিছু কিছু আয়াত। নবী (স) পরিষ্কার ভাষায় বলে দিলেন যে, اِنَّ الْجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ অবশ্যই বেহেশত তরবারির ছায়াতলে।" অর্থাৎ আল্লাহর পছন্দ মত সমাজ কায়েম না করলে আল্লাহর রেজামন্দি হাসিল করা যায় না। আল্লাহর রেজামন্দি

www.pathagar.com

হাসিল না করতে পারলে বেহেশত পাওয়া যায় না। আর এ কাজ তরবারি ছাড়াও হয় না।[১] তাই আল্লাহর নবী অত্যন্ত যুক্তি সঙ্গত কথাই বললেন যে, "তরবারির ছায়া তলেই বেহেশত"। মনে রাখতে হবে আল্লাহ কস্মিনকালেও পছন্দ করেন না যে তাঁরই দুনিয়ায় তাঁরই ইচ্ছার বিরুদ্ধে মানুষ চলবে। তাই তাঁর (আল্লাহর) ইচ্ছা মুতাবি কিভাবে সমাজ গড়া যাবে তা শিক্ষা দেয়ার জন্যেই নবী (স)-কে আল্লাহ ডেকে নিলেন সাত তবক আসমানের উপরে। সেখানে নিয়ে শিখালেন এমন কিছু আইন-কানুন ও নিয়ম নীতি যা বাস্তবায়নের ফলে কায়েম হলো ইসলামী হুকুমত, যে হুকুমতের মাধ্যমে মানুষের জীবন থেকে দূর হলো যাবতীয় অশান্তি আর জীবনে ফিরে এলো পরম শান্তি ও পূর্ণ নিরাপত্তা।

মি'রাজের শিক্ষা অনুযায়ী নবী (স) কায়েম করলেন জনকল্যাণ মুখী এক আদর্শ খিলাফত যা আবহমান কাল ধরে হয়ে থাকবে সারা বিশ্বের মানব জাতির জন্যে অনুকরণ ও অনুসরণযোগ্য রাষ্ট্র ব্যবস্থা সে খেলাফতের সার্বভৌমত্বের মালিক হলেন আল্লাহ। সেখানে সব মানুষ হলো আল্লার দাস আর খতম হলো মানুষের উপর থেকে মানুষের প্রভুত্ব। সে রাষ্ট্রের যিনি যখন খলিফা হয়েছেন তিনিই নিজেকে জনগণের খাদেম বলে মনে করতেন। তাঁরা যা খুশী তা করতেন না। যা-ই করতেন তা পরকালের জবাব দিহির ভিত্তিতেই করতেন। সে রাষ্ট্রের জনগণের প্রত্যেকটি কাজই ইবাদতে পরিণত হত। (১) সেখানকার খলিফা ও জনসাধারণ একই বাজারে একই অবস্থায় যখন গায়ে লাগা-লাগি করে বাজার করতেন তখন পরিচয় না দিলে কেউই চিনতে পারত না যে, এর মধ্যে কে খলিফা ও কে সাধারণ লোক। এইটাই ছিল সে খেলাফতের বৈশিষ্ট্য। বস্তুতঃ এই ধরনের একটা জীবন ব্যবস্থা সমাজে কায়েম করার আদেশই ছিল উপরোক্ত আয়াত– لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّيْنِ كُلِّهِ

১। এ যুগে যা আন্দোলন, দাবী উত্থাপন ও ভোটের মাধ্যমে সম্ভব সে যুগে তা ছিল তরবারির মাধ্যমে সম্ভব। তাহলে সে যুগে তরবারি বলতে এ যুগের ইসলামী আন্দোলন, দাবী উত্থাপন ও দাবী মুতাবিক সরকার গঠনের উদ্দেশ্যে ভোট প্রদানই বুঝতে হবে। ঐ হাদীসের অর্থ এখন এইরূপ করা ঠিক হবে না যে এখন তরবারি ধরতেই হবে। এখানে দেখতে হবে সে যুগে যে উদ্দেশ্যে তরবারি ধরা হয়েছিল, এখন সেই উদ্দেশ্য কিসের মাধ্যমে হাসিল হয়। যার মাধ্যমে তা হাসিল হয় ঐটাই এ যুগের তরবারি, আর তারই ছায়াতলে বেহেশত। এই কথাই বুঝতে হবে উপরোক্ত হাদীস থেকে।

www.pathagar.com

প্রকৃতপক্ষে রাষ্ট্রব্যবস্থা ইসলামী না হ'লে সেখানে মাথা ঠুকে মরে গেলেও ইসলামের সবগুলো হুকুম কিছুতেই মেনে চলা যায় না। তাই পুরা ইসলাম যেন মেনে চলা যায় তার পরিবেশ সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যেই হুজুর (স) একটানা ২৩ বছর ধরে সংগ্রাম করে কায়েম করলেন ইসলামী খেলাফত। এর পরই তিনি ক্ষ্যান্ত হলেন। নাযিল হলো সূরা নাছর। নবী (স) বুঝলেন এবার আমার কাজ শেষ। আমার জিন্দিগিও শেষ। তিনি বুঝে সুঝেই বিদায়ী ভাষণ দিলেন আর বললেন আমাকে সামনের হজ্জে আর হয়ত পাবে না। আমাকে যে কাজের জন্য আল্লাহ পাঠিয়েছিলেন তা পুরা হয়ে গেছে। এখন আর কেউ ইসলাম বিরোধী নেই। কাজেই আমার কাজ শেষ। আরবের লোক দেখল, সারা দুনিয়ার মানুষ দেখল, ইসলাম বিরোধীরাও দেখল যে মানুষ কেমন পরিপূর্ণ শান্তি ভোগ করছে। কোন চোর বদমায়েশের ভয় নেই। হাইজ্যাকের ভয় নেই। চোরা কারবারী ও স্মাগলিং এর ভয় নেই। গুপ্ত হত্যার ভয় নেই। ফাঁকিবাজি ফেরেববাজির ভয় নেই মিথ্যা জোর জুলুমের ভয় নেই। ধোকাবাজি প্রতারণার ভয় নেই। মৌলিক অধিকার বিঘ্নিত হওয়ার ভয় নেই। আর ভয় নেই হক কথা বলার। ন্যায়ানুগ কাজ করতে গেলেও এ ভয় নেই যে পাছে লোকে কিছু বলে। অসহায়দের ভয় ছিল না যে সহায় সম্বলের অভাবে কিংবা বিনা চিকিৎসায় মরবে। বিধবাদের এ ভয় নেই যে এখন কে আর আমাদের কামাই করে খাওয়াবে। পিতৃ-মাতৃহীন ইয়াতিম বাচ্চাদের এ ভয় ছিল না যে, আমরা কি ভাবে বাঁচব ও কিভাবে মানুষ হব। অবলা নারীদের এ ভয় ছিল না যে আমরা ন্যায় অধিকার থেকে বঞ্চিত হব। নিঃসঙ্গ যুবতীদের এ ভয় ছিল না যে, কেউ আমাদের দিকে লোলুপ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখবে। অন্ধ-কানা খোঁড়াদের এ ভয় ছিল না যে আমরা কিভাবে বাঁচবো। এইভাবে উৎখাত হলো ভয়ের যাবতীয় উৎস মুখ, বন্ধ হলো অশান্তি ঢুকার যাবতীয় চোরা দরজা। আর কায়েম হলো অনাবিল শান্তি। এই ধরনের একটা সমাজ কায়েম করাই ছিল নবী (স)-এর কাজ। আর এ কাজ যোগ্যতার সাথে যেন করতে পারেন তার ট্রেনিংই হয়েছিল মি'রাজে। এ কাজ যিনি করলেন অর্থাৎ যিনি সমাজে কায়েম করলেন পূর্ণ শান্তি, একমাত্র তাঁকেই বলা যেতে পারে শান্তির অগ্রদূত। তিনি শুধু আরবের জন্যই শান্তির প্রতিষ্ঠাতা ছিলেন না; তিনি ছিলেন সারা পৃথিবীর মানুষের শান্তিদাতা। তাঁর প্রতিষ্ঠিত সমাজ ব্যবস্থার মধ্যেই ছিল শান্তির একমাত্র গ্যারান্টি। এই

www.pathagar.com

জন্যই আল্লাহ তাঁকে বললেন বিশ্বের শান্তিদূত বা রাহমাতুল্লিল আ'লামীন। যখন তাঁর চেষ্টায় শেষ পর্যন্ত শান্তি কায়েম হলো তখন তাঁর রাহমাতুল্লিল আলামীন নাম সার্থক হলো।

চিন্তার বিষয়

আমরা সাধারণত ঃ মি'রাজ সম্পর্কে যে সব লেখা পড়ি তাঁর বেশীর ভাগ লেখাই অলৌকিক ঘটনাবলীতে ভরা। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মি'রাজের আসল উদ্দেশ্য কি ছিল শুধু অলৌকিক কিছু ঘটনা দেখানো? না তা নয়, ধরুন, যদি বাংলাদেশ থেকে কাউকে বিশেষ সামরিক ট্রেনিং দেয়ার উদ্দেশ্যে লন্ডন পাঠান হয় আর তিনি যদি ৫ বছরের টেনিং শেষ করে বাড়ী এসে প্রতিবেশীদের নিকট লণ্ডন যাওয়ার কাহিনী শুনাতে গিয়ে বললেন– কেমন ভাবে প্লেনে করে কোন কোন দেশের উপর দিয়ে উড়ে গিয়েছিলেন, লণ্ডনের আবহাওয়া, সেখানকার অধিবাসীদের জীবন-যাপন পদ্ধতি, তাদের খাওয়া পরার ধরন-ইত্যাদি বহু কিছু তিনি বললেন যা আমাদের নিকট অদ্ভুত বলে মনে হলো। ধরে নিন তিনি বললেন "আমরা প্লেনে করে প্রায় ২/৩ মাইল উপর দিয়ে উড়ে যাই। সেখান থেকে নীচের দিকে চেয়ে দেখেছিলাম যেন বড় গাছগুলোকে ছোট বেগুন মরিচের গাছের ন্যায় মনে হচ্ছিল, মানুষগুলোকে পুতুলের ন্যায় দেখাচ্ছিল। পদ্মা, মেঘনা, যমুনা, সিন্ধু ইত্যাদি নদীগুলোকে ছোট্ট সরু আঁকা বাঁকা পথের ন্যায় মনে হচ্ছিল। পরে লন্ডনের ভৌগোলিক বিবরণ দিতে গিয়ে তিনি বললেন, "সেখানে অত্যন্ত শীত; শীতকালে গাছের পাতাগুলো সব ঝরে পড়ে যায়। বসন্তের হাওয়া বইলে আবার গাছের পাতা গজায়। সেখানকার লোকগুলো সাদা রংয়ের। নদী-নালা আছে বটে কিন্তু তার হাওয়া আমাদের দেশের মত আদ্র নয়। সেখানে শীতকালে একটানা তিন মাস স্কুল বন্ধ থাকে। তখন দিনগুলো হয় খুব ছোট। কখনও কখনও পানি জমে বরফ হয়ে যায়। সেখানে প্রতিটি বিল্ডিং এর মাটির নীচে একটি করে তলা আছে। সেখানে যে বিল্ডিংটা এক তলা বিল্ডিং হিসাবে আত্ম পরিচয় দিচ্ছে আসলে সেটা দোতলা। আর যেটাকে ৫ তলা বিল্ডিং দেখায় সেটাও আসলে কিন্তু ৬ তলা। কারণ প্রত্যেক বিল্ডিং-এর নীচে আর একটি করে তলা সেখানে থাকেই। এইভাবে তিনি লন্ডনের কাহিনী বলেই চলছেন। তিনি বললেন সেখানে আমাদের দেশের ন্যায় টাটকা মাছ পাওয়া যায় না। সমুদ্র থেকে মারা এক

www.pathagar.com

প্রকার কাটা মাছ আসে যা আমাদের দেশে দেখা যায় না। সে সব মাছ খেতে কেমন যেন ভোটকা গন্ধ লাগে, তবুও তা খেয়েছি। সেখানে কড়া মশলা পাতির রান্না নেই। ডিমগুলো তারা সিদ্ধ বা অর্ধ সিদ্ধ করে লঘু পাক করে খায় ইত্যাদি ধরনের খাবার গল্পও করলেন। রাস্তাঘাটের বর্ণনা দিতে গিয়ে বললেন যে লণ্ডন শহরের মাটির নীচদিয়েও লম্বা পথ তৈরী করে রেখেছে। সে এক অদ্ভুত শহর। আমরা বাংলাদেশের মানুষ শুনে তো একেবারে তাজ্জব হয়ে আল-হামদুলিল্লাহ সুবহানাল্লাহ অনেক কিছু পড়ে আল্লার শুকরিয়া আদায় করলাম কিংবা বিস্ময় প্রকাশ করলাম। কিন্তু এতক্ষণ পর্যন্ত এই যা কিছু শুনলাম এতে কি ঐ ব্যক্তির লণ্ডন প্রশিক্ষণের মূল বিষয়বস্তুর কিছুই জানা হলো? না, তা হয়নি। ঠিক তদ্রূপই রাসূলে পাক (স)-এর মি'রাজের ভ্রমণ কাহিনীর অলৌকিক ঘটনাবলী শুনলেই মি'রাজের আসল শিক্ষা জানা হয় না। মি'রাজের আসল শিক্ষা অন্য কিছু যা আমি একে একে বলব ইনশাআল্লাহ।

ট্রেনিং-এর যৌক্তিকতা

আমাদের সাধারণ জ্ঞান দ্বারাই বুঝি যে সমাজের সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ কাজে যাদেরকে বহাল করা হয় তাদেরকে প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ বা ট্রেনিং এর মাধ্যমে যোগ্য করে গড়ে তোলা হয়। যেন তাঁদের উপর ন্যাস্ত গুরুদায়িত্ব যোগ্যতার সঙ্গে তারা পালন করতে পারেন। তাই কাজের ও দায়িত্বের গুরুত্ব অনুযায়ী প্রত্যেক নবীকেই আল্লাহ পাক কিছু না কিছু অতিরিক্ত শিক্ষা দিয়েছিলেন।

আমরা দেখি একজন সাধারণ পুলিশকেও তার দায়িত্ব পালনের উপযোগী করে গড়ে তুলবার জন্য ট্রেনিং দেয়া হয় কিন্তু তার ট্রেনিং সারদাতেই হতে পারে এবং তা কম সময়ের মধ্যেই সমাধা হতে পারে কিন্তু যিনি সামরিক বিভাগের প্রধান হিসাবে দায়িত্ব পালন করেন তার দায়িত্ব যেমন ভারী তেমন তার ট্রেনিংটাও ভারী ও লম্বা সময়ের। তার ট্রেনিং এর স্থানও হয় পৃথিবীর কোন বড় রাষ্ট্রের রাজধানীতে। আমরা একটু চিন্তা করলে দেখতে পাই যে, পূর্ব যামানার নবী (আ) যাঁরা বিশ্ব নবী ছিলেন না তাদের মি'রাজ হয়েছিল দুনিয়াতেই এবং কম সময়ের মধ্যেই। যেমন হযরত মুসা (আ)-এর মি'রাজ হয়েছিল তূর পাহাড়ে ৪০ দিনের জন্য। কিন্তু নবী (স) যেহেতু বিশ্বনবী ছিলেন কাজেই তার কাজের

www.pathagar.com

আওতা ছিল যেমন বিশ্বব্যাপী তেমন ট্রেনিংও ছিল ব্যাপক ভিত্তিক এবং তার স্থানও ছিল একেবারে স্বয়ং খোদার রাজধানীতে আরশে মুয়াল্লায় এবং তা ছিল দীর্ঘ সময়ের।

আল্লাহর নবীকে আরশে মুয়াল্লায় পৌঁছে দেবার পথের আজায়েব গারায়েব অনেক ঘটনাই আমাদের জানা আছে কাজেই সেইটা আমি আলোচনা করব না। আমি এখানে সংক্ষেপে আলোচনা করব তা-ই যার মধ্যে মিলবে আধুনিক প্রশ্নের জবাব ও বলব সেই সব ঘটনা যা আমাদের বাস্তব জীবনে কোন ফল দেবে।

মিরাজের দিন তারিখ ও পথের কাহিনী

নবুয়তির দ্বাদশ বছরে হুজুর (স)-এর ৫২ বছর বয়সে ২৭শে রজব বুধবারের রাত্রে মি'রাজ হয়েছিল। সেদিন তিনি উম্মে হানির ঘরে নিদ্রামগ্ন ছিলেন। এমন সময় হযরত জিব্রাঈল (আ) ও হযরত মিকাইল (আ) এসে তাকে ঘুম থেকে জাগিয়ে যম যম কূপের পার্শ্বে নিয়ে যান। সেখানে সিনা চাক হয়। যমযমের পানি দ্বারা ভিতর অঙ্গগুলি ধুয়ে পরে তা জুড়ে দেয়া হয়; অতঃপর বোর্রাকে সওয়ার হয়ে তিনি মক্কা থেকে বায়তুল মুকাদ্দাস পর্যন্ত সফর করেন। পথিমধ্যে মদিনায়, তূর পাহাড়ে ও বায়তেলাহামে [হযরত ঈসা (আ)-এর জন্মস্থান] এই তিন জায়গায় হযরত জিব্রাঈল (আ)-এর পরামর্শে নামায আদায় করেন। পরে বায়তুল মুকাদ্দাসে গিয়ে সমস্ত নবীদের ইমাম হয়ে দুই রাকাত নামায আদায় করেন। অতঃপর পুনরায় বোর্রাকে সওয়ার হয়ে উর্ধ্বলোকে গমন করেন। আল্লাহ ইচ্ছা করলে বোর্রাক ছাড়াও নিতে পারতেন কিন্তু তা না নিয়ে বোর্রাকে নেওয়ার অর্থ হলো হুজুর (স)-কে অতিরিক্ত সম্মান দেয়া। যেমন কাউকে এমনিভাবে ডেকে পাঠাই আবার সম্মানিত লোক হলে তার জন্যে গাড়ীও পাঠাই। আল্লাহর নবী যেহেতু আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয় নবী তাই তার সম্মানার্থে বোর্রাক পাঠিয়েছিলেন, তাতে করে তিনি পৌঁছে গেলেন আল্লাহর রহমতের অতি নিকটে। যাবার পথে প্রথম আসমানে দেখা হলো হযরত আদম (আ)-এর সঙ্গে। দেখলেন আদম (আ)-এর ডান দিকে সাদা রং-এর রূহ্ ও বাম দিকে কাল রং-এর রূহ্। তিনি দেখলেন আদি পিতা হযরত আদম (আ) ডান দিকে ফিরে হাসছিলেন (তারা ছিলেন নেককার আওলাদ) আর বাম দিকে চেয়ে কাঁদছিলেন (তারা ছিলেন গোনাহগার

www.pathagar.com

আওলাদ) অতঃপর ২য় আসমানে হযরত ঈসা (আ), ৩য় আসমানে হযরত ইউসূফ (আ), ৪র্থ আসমানে হযরত ইদ্রিস (আ), ৫ম আসমানে হযরত হারুন (আ), ৬ষ্ঠ আসমানে হযরত মূসা (আ) এবং ৭ম আসমানে হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়। অতঃপর বায়তুল্লাহ শরীফ সোজাসুজি ঠিক উপরে যেখানে বায়তুল মামুর অবস্থিত সেখানে পৌঁছে যান। সেখানে যে অগণিত ফেরেশতা দেখেন তার কোন সীমা সংখ্যা নেই। তিনি দেখলেন বায়তুল মামুরে প্রতিদিনই ৭০ হাজার ফেরেশতার একটা করে নতুন দল এসে সে ঘরকে তাওয়াফ করছে। কোন ফেরেশতাই ২ বার তাওয়াফ করতে সুযোগ পায় না। তিনি দেখলেন যে আল্লাহর রাজত্বের পরিসীমা কত দূর দূরান্ত নিয়ে পরিব্যপ্ত। পৃথিবীর লোক সংখ্যার চাইতেও কত কোটি কোটি গুণ বেশী ফেরেশতা সেখানে সৃষ্টি করে রেখেছেন।[১] সে আর এক স্বর্গীয় জগত। এরপর নবী (স) এমন এক জগতে গেলেন যে স্থান শুধু আল্লাহর নূরের তাজাল্লি দ্বারা পরিব্যপ্ত ছিল। যার দিকে চোখ মেলে চেয়ে দেখতে গেলে মানুষ গলে পানি হয়ে যাওয়ার কথা। অথচ নবী (স) তা দেখতে পেলেন। তাই আল্লাহ বলেন–

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى - তা দেখার সময় নবী (স)-এর দৃষ্টিতে বক্রতা আসেনি এবং চোখ ঝলসে যায় নি।

অতঃপর নবী (স)-এর সঙ্গে আল্লাহর কথা শুরু হলো। মানুষ যেমন কোন মহামান্য ব্যক্তির নিকট গিয়ে উপস্থিত হয়ে প্রথমে সালাম করে সামনে দাঁড়ায় ঠিক তেমনই হযরত নবীয়ে পাক (সা) মহান আল্লাহর দরবারে উপস্থিত হয়ে সালাম দিলেন 'আত্তাহিয়্যাতুলিল্লাহে ওয়াচ্ছালাওয়াতু ওয়াত্তাইয়েবাতু' বলে আল্লাহ তার জবাবে বললেন 'আচ্ছালামু আলাইকা আইয়ুহান্নাবীউ ওয়া রাহমাতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।' নবী (স) পুনরায় বললেন 'আচ্ছালামু আলাইনা

ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিচ্ছালিহীন।' ফেরেশতাগণ যারা এসব কথা শুনছিলেন তাঁরা এই কথাগুলো শোনার পর সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আশহাদু আল্লাইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আবদুহু

১। وَمَا يَعْلَمُ جُنُوْدَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ আপনার প্রভুর সৈন্য সংখ্যা তিনি ছাড়া আর কেউ জানে না।

www.pathagar.com

ওয়া রাসূলুহু। এই কথাগুলোর সমষ্টিই হচ্ছে আমাদের 'আত্তাহিয়াতু' (যাকে তাশাহ্হুদ বলা হয়)। এসব কথাগুলোর মূল তাৎপর্য হলো এই যে নবী (স) আল্লাহর দরবারে গিয়ে প্রথমেই বললেন যে হে আল্লাহ পাক আমার দৈহিক, আত্মিক এবং মানসিক এবাদত বা আনুগত্য ও দাসত্ব একমাত্র তোমারই উদ্দেশ্যে। তুমিই মহান ও তুমিই পবিত্র। এর জবাবে আল্লাহ পাক খুশী হয়ে বললেন আপনার উপর আমার দেয়া শান্তি বর্ষিত হবে ও হতে থাকবে।

এ কথায় আল্লাহর নবী অত্যন্ত খুশী হলেন ঠিকই কিন্তু আরশে মুয়াল্লায় গিয়ে শুধু নিজের জন্য শান্তি চেয়ে আনবেন আর উম্মতের জন্যে তা চাইবেন না আমাদের দয়ার নবী তেমন ছিলেন না। কাজেই মিরাজের বিশেষ দান হিসাবে যখনই আল্লাহ পাক তাঁর নবীকে শান্তি দিতে চাইলেন তখনই নবী (স) বললেন– আমার একার জন্য নয়, বরং আমার তামাম উম্মত ও সৎ-কর্মশীল ব্যক্তিদের প্রত্যেকের জন্যেই আমি শান্তি চাই। এসব কথাগুলো আল্লাহর ফেরেশতাদের নিকট অত্যন্ত ভাল লেগেছিল, তাই ফেরেশতাগণ খুশী হয়ে সবাই মিলে সমস্বরে বলে উঠলেন, 'আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াশহাদু আন্না মুহাম্মাদান আব্দুহু ওয়া রাসূলুহু।" অর্থাৎ আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি যে আল্লাহ ছাড়া আর কেউ আইনদাতা হুকুম কর্তা ও সার্বভৌমত্বের মালিক নেই আর হযরত মোহাম্মদ (সা) তাঁর বান্দা ও রাসূল।

এখানে লক্ষণীয় যে আল্লাহ তাঁর নবীকে ডেকে নিয়ে প্রথম কথাই বললেন যে আমি শান্তি দিতে চাই, ইহকালে ও পরকালে فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ এ শান্তি কি আকাশ থেকে বৃষ্টির ন্যায় নাযিল হওয়ার মত কোন কিছু? ভিক্ষুকরা যখন দু'মুঠো চাউল ভিক্ষা চায় তখন সে চাউল আনার জন্য একটা থলে সঙ্গে করে নিয়ে যায়। কেউ তাকে দুমুঠো চাউল দিলে সে চাউল গুলো তার পিছনে পিছনে হেঁটে হেঁটে ভিক্ষুকের বাড়িতে গিয়ে উঠে না। তা কোন পাত্রে করে আনতে হয়। কেউ বাজারে দুধ কিনতে গেলে একটা দুধের ভাড় নিয়ে যায়। এবার বলুন আল্লাহ যে শান্তি দিতে চাইলেন সে শান্তি মানব জীবনে আসবে কোন পাত্রের মাধ্যমে? তার একটা ব্যবস্থা কি থাকতে হবে না? সেই ব্যবস্থাটাই হচ্ছে ইসলামী খেলাফত। এইটাই শান্তির পাত্র বা পথ। এই পথেই আসে মানব জীবনে শান্তি। আর

www.pathagar.com

ফেরেশতাদের কথা থেকে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মানুষ যেন আল্লাহকে ছাড়া আর কাউকেই ইলাহ হিসাবে না মানে। আল্লাহকে সর্বতোভাবে ইলাহ হিসাবে মানলেই বা মানতে পারলেই সে সমাজে শান্তি আসতে পারে; নইলে পারে না। এই প্রথম কথাগুলো থেকেই তার ইঙ্গিত পাওয়া গেল যে সেই শান্তি কায়েমের নিয়ম-কানুনই শেখান হবে মি'রাজ থেকে।

আল্লাহর সঙ্গে নবী (স)-এর প্রথম কথোপকথনের (আত্তাহিয়াতুর) প্রত্যেক শব্দই তাৎপর্যপূর্ণ ও ব্যাখ্যা সাপেক্ষ। উপরে .... اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ -এর ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে আল্লাহ শান্তি দিতে চান। এবার তার পরবর্তী কথাটির উপর কিছুটা আলোচনা করব। নবী (স) আল্লাহর কথা (শান্তি, রহমত ও বরকত দেয়ার ঘোষণা) শেষ হতে না হতেই বললেন ঃ

اَلسَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلٰى عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ ـ

আল্লাহর দেয়া শান্তি নিজের জন্যে না চেয়ে সমস্ত عِبَادِ صَالِحْ দের জন্যে চাইলেন। আর আল্লাহ তা দিতেও রাজি হলেন। শুধু রাজিই নয় বরং ওয়াদাও করলেন। এ ওয়াদার কথা সূরা নূরের মধ্যে আল্লাহ নিম্নোক্ত আয়াতে ঘোষণা করেছেন–

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ ص وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِيْنَهُمُ الَّذِى ارْتَضٰى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ اَمْنًا ط يَعْبُدُوْنَنِىْ لَا يُشْرِكُوْنَ بِىْ شَيْئًا ط وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذٰلِكَ فَاُولٰئِكَ هُمُ الْفٰسِقُوْنَ ـ (النور)

অর্থাৎ- আল্লাহ ওয়াদা করেছেন তোমাদের ঈমানদারদের মধ্যে যারা সৎকর্মশীল (عِبَادِ صَالِحْ) তাদেরকে অবশ্যই পৃথিবীর খেলাফতি বা আধিপত্য দান করবেন যেমন খেলাফত দান করেছিলেন তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে এবং অবশ্যই তিনি (আল্লাহ) তাঁদের (عِبَادُ اللّٰهِ) اَلصّٰلِحِيْنَ ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করবেন যা তিনি তাদের জন্যে মনোনীত করেছেন। (ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত করার অর্থই হলো ধর্মের যাবতীয়

www.pathagar.com

আইন-কানুন–যা মুসলমান জাতি মেনে চলার শপথ করেছে وَقَبِلْتُ جَمِيْعَ اَحْكَامِهٖ وَاَرْكَانِهٖ বলে তা মেনে চলার পুরা ক্ষমতা দান করা) এবং অবশ্যই তিনি তাদের ভীতির পর নিরাপত্তা প্রদান করবেন। অর্থাৎ গায়ের ইসলামী হুকুমতে যে ধরনের ভয়-ভীতি ও ত্রাসের রাজত্ব কায়েম হয়, তা অপসারিত হবে ও নিরাপত্তা কায়েম হবে। তখন তারা সত্যিকার অর্থে ইবাদত করবে, কোন প্রকার শেরেকী করবে না– আর এর পর যারা অবাধ্য হয়ে যাবে– তারা সবাই আল্লাহর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্নকারী ফাসেকে পরিণত হবে।" আন-নূর

উপরোক্ত আয়াত শরীফে عَمِلُوا الصّٰلِحٰتِ শব্দের দ্বারা সৎকর্মশীল লোকদেরকে বুঝান হয়েছে। মনে রাখবেন আল্লাহর নবী صَالِحِيْن দের জন্যেই শান্তি চেয়েছিলেন। তাই আল্লাহ শুধু صَالِحِيْن দেরকেই বেহেশত দেয়ার অঙ্গীকার করেছেন এবং দুনিয়ার শান্তি ও নিরাপত্তা আল্লাহ তাদেরকেই দেয়ার ওয়াদা করেছেন। তাহলে অবশ্যই আমাদের উচিৎ عَمَلِ صَالِحْ শব্দের পুরা ব্যাখ্যা জানা, যেন সেই মুতাবিক কাজ করে আমরা عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -এর মধ্যে দাখিল হতে পারি। عَمَلِ صَالِحْ অর্থ যেটাই ভাল কাজ সেটাই করা। এখন দেখা দরকার ভাল কাজ বলতে কি বুঝায়। আমার মতে ভাল কাজগুলোকে কাজের গুরুত্ব অনুযায়ী ৫ ভাগে ভাগ করা যায়। এর মধ্যে যেটা সহজে করতে পারা যায় সেটাকেই ১নং ভাল কাজ বলতে পারি। এরপর কঠিন থেকে কঠিনতম কাজগুলোকে পর্যায়ক্রমে নম্বর দিয়ে এভাবে সাজাতে পারি, যথা ঃ-

১নং ভাল কাজ ঃ নামায পড়া, রোযা রাখা, দাড়ী রাখা, টিলা জামা পরিধান করা, টিলা কুলুখ ব্যবহার করা ইত্যাদি কাজ। যা করতে কোন প্রকার পার্থিব স্বার্থহানির ভয় নেই ও মেহনতও কম। এগুলো সহজেই করা যায়।

২নং ভাল কাজ ঃ ঐ কাজগুলোই অন্য মুসলমান ভাইদেরকে দিয়ে করানো যা ১ম টার চাইতে অপেক্ষাকৃত কঠিন। এ কাজটার যথাযথ আঞ্জাম দিয়ে থাকেন তাবলীগের মুবাল্লিগগণ।

www.pathagar.com

৩নং ভাল কাজ ঃ যাবতীয় অন্যায় কাজ থেকে নিজেকে বিরত রাখা। খেয়াল করে দেখবেন নামাযী হওয়া যত সহজ সত্যবাদী ও হালালখোর হওয়া কিংবা চরিত্রবান হওয়া তত সহজ নয়। চিন্তা করুন হযরত আদম (আ) ও মা হাওয়া আল্লাহ্ পাকের না সূচক হুকুমটাই মানতে ব্যর্থ হয়েছিলেন কিন্তু كُلَّا مِّنْهَا (অর্থাৎ বেহেশতের ফল ফলাদি তোমরা দু'জনে খাও।) এর হ্যাঁ সূচক হুকুমটা অমান্য করেননি।

৪নং ভাল কাজ ঃ অপর মুসলমান ভাইদেরকেও অন্যায় কাজ থেকে বিরত রাখা। এ কাজগুলো সাধারণতঃ সমাজের ওলামা সম্প্রদায় ওয়াজ নছিহতের মাধ্যমে কিছুটা আঞ্জাম দিয়ে থাকেন। (পুরা আঞ্জাম দেয়ার জন্য রাজশক্তির প্রয়োজন)

৫নং ভাল কাজ ঃ সমাজ থেকে যাবতীয় অন্যায় তুলে দিয়ে সেখানে ন্যায়কে প্রতিষ্ঠিত করা। এটাকে দুনিয়ার কেউ মন্দ কাজ বলবে না। সবাই এ কাজকে সর্বাপেক্ষা ভাল কাজ বলবে। কাজেই عَمَلٍ صَالِحٌ এর মধ্যে এ কাজ যে আছে; তা দুনিয়ার প্রত্যেকেই স্বীকার করবে।

বলাবাহুল্য আল্লাহর নবীগণ এই ৫নং এর ভাল কাজ করতে গিয়েই মার খেয়েছিলেন। আজও যারা একাজ করতে যান তারা মার খান।

এ কাজ কোন সংগঠনের মাধ্যমে ছাড়া একা একা হয় না। দেখুন মিশরে 'ইখওয়ানুল মুসলেমীন' এর মাধ্যমে এ কাজ যারা করতে গিয়েছিলেন তাদের দশাটা কিরূপ হলো। ৫ নং এর ভাল কাজ করতে গেলে এরূপ হবেই। কিন্তু এর জন্যে যদি এই নম্বরটা বাদ দিয়ে আরগুলো করি তাহলে দুনিয়ার কেউই শত্রু হবে না ঠিকই এবং দুনিয়ার লোক কদমবুচিও করবে কিন্তু ভাল কাজের সবটুকু না করলে عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ এর মধ্যে দাখিল হওয়া যাবে না। মনে রাখতে হবে কাজের মাধ্যমে যদি عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ -এর মধ্যে দাখিল হওয়া না যায় তবে মানুষের কদমবুচি, মানুষের ভক্তি, মানুষের প্রশংসা, মানুষের দেয়া খেতাব, এর কোনটাতেই আল্লাহর দরবারে কাজ হবে না। অর্থাৎ ভাল হতে হবে আল্লাহর কাছে; মানুষের কাছে নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে বুঝা গেল।

www.pathagar.com

১। عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ এর মধ্যে দাখিল হতে পারলে শান্তি পাওয়া যাবে فِى الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ দুনিয়ায় ও আখেরাতে, অন্যথায় নয়।

২। উক্ত দলে শামিল হতে হলে যেটাই ভাল কাজ সেটাই করতে হবে।

৩। এ কাজ করলে তাদেরকে আল্লাহ অবশ্যই পৃথবীর খেলাফত দিবেন।

৪। আর তখনই ধর্মীয় যাবতীয় বিধি বিধান মেনে চলা যাবে।

৫। তখনই পৃথিবী থেকে ত্রাসের রাজত্ব দূর হয়ে নিরাপত্তা প্রবর্তিত হবে।

৬। মানুষ তখন সত্যিকার অর্থে যা ইবাদত তা করতে পারবে।

৭। তখন বাধ্যতামূলক শেরেকী করা থেকে মানুষ রেহাই পাবে।

৮। মার খাওয়া থেকে এড়িয়ে চললে লোকের কাছে ভাল হওয়া যায় ঠিকই কিন্তু পুরোপুরি عِبَادِ اللّٰهِ الصَّالِحِيْنَ এর মধ্যে দাখিল হওয়া যায় না।

৯। প্রত্যেকটি কাজের জন্যে যেমন মাধ্যম দরকার তেমনই শান্তি ও নিরাপত্তার জন্যে যে মাধ্যম দরকার তাহলো ইসলামী খেলাফত।

১০। তা হলে সে খেলাফতের মূলনীতি কি হবে তা অবশ্যই আল্লাহ শিক্ষা দিবেন এবং তা কিভাবে চলতে পারবে তার ট্রেনিংও দেয়ার দরকার।

বলাবাহুল্য ঐসব শিক্ষার উদ্দেশ্যেই ছিল মি'রাজ। এ উদ্দেশ্যে যে সব মূলনীতি আল্লাহ দিয়েছিলেন তা এ বইয়ের শেষাংশে অপর এক দারসের মধ্যে আলোচনা করা হয়েছে।

মিরাজ উর্ধ্বলোকে কেন?

উর্ধ্বলোক ও নিম্নলোক সম্পর্কে কিছুটা ব্যাখ্যা হওয়া উচিত। আমরা সাধারণত ঃ যেটাকে বলি উর্ধ্বদিক, আমেরিকার মানুষ সেটাকেই বলে নিম্ন দিক। প্রকৃতপক্ষে উর্ধ্ব-অধঃ সম্পর্কে আমাদের যা ধারণা তা হলো মধ্যাকর্ষণের কারণে। মধ্যাকর্ষণ পৃথিবীর বহির্ভাগ থেকে প্রত্যেকটি পদার্থকেই তার নিজের দিকে আকর্ষণ করে, তাই পৃথিবীর দিকটাকে নীচু মনে করি আর এর বহির্ভাগকে উঁচু মনে করি। আমরা বলি সূর্য পৃথিবী থেকে ৯কোটি ৩০ লক্ষ মাইল উপরে। এ কথা শুধু দুপুর ১২ টার সময় ঠিক। কিন্তু রাত ১২ টার সময় ঐ কথা ঠিক নয়। তখন ঠিক হচ্ছে এই যে পৃথিবী সূর্য থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল উর্ধ্ব। প্রকৃতপক্ষে কথাটা এই

www.pathagar.com

যে, পৃথিবী সূর্য থেকে উপরেও নয় নীচেও নয়, তা হলো দূরে। উপর নীচুর ধারণা শুধুমাত্র মধ্যাকর্ষণের আওতার মধ্যে। তাহলে মিরাজকে কি উর্ধ্ব লোকে না নিম্নলোকে বলব? হ্যাঁ এই অর্থে উর্ধ্বলোকে বলতে পারি যে, পৃথিবীর বাইরেরপাশটাই উপর। কিন্তু মধ্যাকর্ষণের বাইরে গেলে কোন দিকই আর উঁচু নিচু থাকে না, সবই হয়ে যায় শুধু দূরে। তা হলে বলতে হবে আরশে মুয়াল্লা আমাদের থেকে বহু বহু দূরে। এখন প্রশ্ন থেকে যায় কেন এতদূর দূরান্তে নবী (স)-কে নিয়ে যাওয়া হলো। আমি পূর্বেই বলেছি যে আল্লাহ তাঁর নবীকে কিছু প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ দিবেন এবং কিছু প্রত্যক্ষ নজীর দেখাবেন তাই তাঁকে ডেকে নিয়েছিলেন খোদ আল্লার রাজধানীতে।

আল্লাহ তাঁর নবীকে যা কিছু দেখিয়েছিলেন তার মধ্যে খোদ খোদার দীদারও শামিল ছিল। আল্লাহ তাঁর নূরের তাজাল্লিও দেখিয়েছিলেন। এই বস্তুর পৃথিবী থেকে তা দেখান ও দেখা সম্ভব ছিল না তাই যেখান থেকে তা দেখা সম্ভব সেখানেই নিয়ে গিয়েছিলেন। আল্লাহ তাঁর নূরের তাজ্জাল্লি এবং আকাশ রাজ্যের যাবতীয় অজাগতিক বস্তুসমূহ দেখার ক্ষমতা ও পূর্ণ সাহস এবং মনোবল সৃষ্টি করার উদ্দেশ্যে মিরাজের পূর্বে একবার হুজুরের সীনা চাক করিয়েছিলেন। পরে আল্লাহর রহমতের পানি দিয়ে অন্তরকে ধুয়ে দেয়া হয়। ফলে মনের মধ্যে সৃষ্টি হয় এমন মনোবল ও সাহস যার জন্যে আকাশ রাজ্য ভ্রমণ করা হুজুরে পাক (স)-এর জন্যে সহজসাধ্য হয়ে যায়।

সাধারণ সৃষ্টি শক্তি দ্বারা যা দেখা সম্ভব না তা নবী (স)-কে দেখানোর উপযোগী করে নিয়ে যখন তা দেখালেন তখন তার দৃষ্টি যে প্রতিহত হয়নি তা বুঝানোর জন্যে আল্লাহ পাক কুরআন মজিদে বলেছেন–

مَازَاغَ الْبَصَرُ وَمَاطَغٰى ـ النجم ـ

অর্থাৎ আল্লাহ, যে সব কিছু দেখিয়েছিলেন তা দেখতে গিয়ে হুজুরের চক্ষুতে বক্রতা বা অমনোযোগিতা আসেনি।" এতে প্রমাণ হয় যে আল্লাহর নূরের তাজাল্লি দেখে মূসা (আ)-এর যে অবস্থা হয়েছিল হুজুরে পাক (স)-এর সে অবস্থা হয়নি, এতে আরও প্রমাণ হয় যে তিনি এমন কিছু দেখিয়েছিলেন যা দেখলে মানুষের দৃষ্টি শক্তি বা চক্ষু زَاغَ ও طَغٰى হওয়ার কথা। আরও প্রমাণ হয় যে, যা তিনি দেখলেন তা আকাশ রাজ্যের বিষয়বস্তু। কাজেই আকাশের জিনিস দেখতে হলেই আকাশেই নিতে হয়, তাই নবী (স)-কে আকাশে নিয়েই সব কিছু দেখিয়েছিলেন।

www.pathagar.com

কত সময়ে নবী (স) মিরাজে গেলেন

আমাদের কোন দূরবর্তী স্থানে যেতে সময় লাগে। কিন্তু বায়ু এবং মধ্যাকর্ষের আওতা বহির্ভূত কোন কিছুকে দূরে যেতে সময় প্রায় লাগেই না। যেমন আওয়াজ যখন ইথারের মাধ্যমে চলে তখন যেহেতু সে আওয়াজকে বায়ু এবং মধ্যাকর্ষণ ধরতে পারে না তাই তা চলে একেবারে আলোর গতিতে। ফলে ওয়াশিটন থেকে কথা বললে সঙ্গে সঙ্গে তা বাংলাদেশে ভেসে চলে আসে। আল্লাহ যেহেতু নবী (স)-কে ঐ দু'টি প্রাকৃতিক শক্তির (বায়ু ও মধ্যাকর্ষণ) আওতা বহির্ভূত করে নিয়েছিলেন তাই তাঁর সময় মোটেই লাগেনি বলতে হবে। অর্থাৎ তখন আর আরশে মুয়াল্লা হুজুরে পাক (স)-এর জন্যে কোন দূরের রাস্তা ছিল না। ছিল মাত্র চোখের এক পলকের রাস্তা। তাই তিনি চোখের এক পলকেই আরশে মুয়াল্লায় পৌঁছে গিয়েছিলেন।

বোর্রাক কি ও আরশে মুয়াল্লা কতদূর?

বোর্রাক ছিল খচ্চরের চাইতে একটু বড় ধরনের একটা প্রাণী বিশেষ। তার নাম বোর্রাক রাখা হয়েছে এই জন্যে যে তার গতি ছিল বারকুনের বা বিদ্যুতের ন্যায়। আরবীতে বিদ্যুত গতির চাইতেও দ্রুত গতি বোঝানোর জন্যে অন্য কোন শব্দ নাই, তাই বারকুন শব্দের সুপারলেটিভ ডিগ্রী যেহেতু বুর্রাক, এ বুর্রাক শব্দ ব্যববহার করে বুঝান হয়েছে যে বিদ্যুৎ গতির চাইতেও দ্রুতগতি সম্পন্ন বাহনে করে তিনি উর্ধ্বলোকে গমন করেছিলেন।

কোন কোন কিতাবে আছে পৃথিবী থেকে প্রথম আসমান পাঁচশত বছরের রাস্তা। কিন্তু কোন গতিতে ৫০০ বছরের রাস্তা এবং বছরটাই বা কতবড় তার কোন ব্যাখ্যা কোন কিতাবে নাই। [থাকলেও আমার চোখে পড়েনি] কিন্তু যুক্তিতে বলে, যেখানে মানুষ যে গতিতে চলে, সেখানে সেই গতিতে কত সময়ের রাস্তা তাই বলা হয়। বলা হয়, চাটগাঁ থেকে জেদ্দা ১২ দিনের রাস্তা। এর অর্থ পানির জাহাজে ১২ দিনের রাস্তা। বলা হয় পৃথিবী থেকে চাঁদ ৮০ ঘন্টার রাস্তা। এর অর্থ রকেটে প্রতি সেকেন্ডে ৮ মাইল গতিতে ৮০ ঘন্টার রাস্তা। যেখানে বলা হয়েছে পৃথিবী থেকে প্রথম আসমান ৫০০ বছরের রাস্তা সেখানে এর অর্থ কি এই হবে যে পায়ে হেঁটে গেলে ৫০০ বছরের রাস্তা? না, তা নয়। এর অর্থ আকাশে থেকে যা পৃথিবীতে আসে তা যে গতিতে আসে সেই গতিতে প্রথম আসমান ৫০০

www.pathagar.com

বছরের রাস্তা। এখন দেখা দরকার আকাশ থেকে পৃথিবীতে কি আসে? দেখি একমাত্র আলোই আসে। তাহলে বলতে হবে আকাশের দূরত্ব পায়ে হাঁটার গতিতে নয় বরং আলোর গতিতে নির্ধারণ করতে হবে। যদি কেউ চলতে চান যে পায়ে হাঁটার গতিতে ৫০০ বছরের পথ ধরতে হবে তাহলে আল-কুরআনের আয়াত দ্বারাই তা খণ্ডিত হয়ে যাবে। যেমন ধরুন যদি পায়ে হাঁটার গতিতে আকাশের দূরত্ব ধরি তাহলে ১টা মানুষ যদি রাতদিন ২৪ ঘন্টাও একভাবে হাটে তা হলেও বড় জোর ৫০ মাইল হাটতে পারে। ধরে নিলাম মানুষ ১ দিনে ৫০ মাইল হাটে। তাহলে ১ বছরে ৩৬৫ × ৫০ মাইল = ১৮২৫০ মাইল × ৫০০ বছর × ৯১২৫০০০ একানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইল। যদি পৃথিবী থেকে প্রথম আকাশ পায়ে হাঁটার হিসাবে ৫০০ বছরের রাস্তা হয় তাহলে আল-কুরআনের এ আয়াতের কি ব্যাখ্যা করবো যেখানে আল্লাহ বলেছেন–

(সূরা মূলক ঃ ৫) وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ অর্থাৎ দুনিয়ার নিকটবর্তী আসমানকে আমি চন্দ্র সূর্য ও জ্যোতিষ্ক দ্বারা সুশোভিত করেছি। অন্য আয়াতে আছে (كَوْكَبٌ) নক্ষত্রগুলো দ্বারা সুশোভিত করেছি। এ আয়াত থেকে স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে প্রথম আসমানের নীচে চাঁদ সূর্য গ্রহ নক্ষত্র যা আকাশে দেখি তা সবই। অথচ ওগুলোর দূরত্ব কমপক্ষে একানব্বই লক্ষ পঁচিশ হাজার মাইলের চাইতে যে বহু বহু গুণে বেশী তা পরীক্ষিত সত্য। তাহলে এখন ঐ ৫০০ বছর থেকে কি বুঝব? এ থেকে আলোর গতিতে ৫০০ বছরের পথ বুঝা ছাড়া আর কোন যুক্তিগ্রাহ্য অর্থ নেয়া যেতে পারে না। তাহলে আরশে মুয়াল্লার দূরত্ব হবে কত? আলোর গতিতে ৫০০ × ৭ = ৩৫০০ বছরের রাস্তা এখন বাকী রইল বছরের ব্যাখ্যা। আমরা যখন পৃথিবী থেকে এক বছর বলি তখন বুঝতে হবে ৩৬৫ দিন কিন্তু যদি প্লুটো গ্রহ থেকে এক বছর বলি তাহলে সে বছরকে ৩৬৫ দিনের বছর ধরলে ভুল হবে। তখন এক বছর থেকে বুঝতে হবে যে তা আমাদের পৃথিবীর ২৪৮ বছরের সমান। অর্থাৎ আমাদের ২৪৮ বছর = প্লুটোর এক বছর। আমরা যেভাবে বছর গুণি তার হিসাব হচ্ছে এক শীতকাল থেকে অন্য শীতকাল পর্যন্ত এক বছর; এক বর্ষাকাল থেকে অপর বর্ষাকাল পর্যন্ত এক বছর। আর এটা হয় এ জন্য যে সূর্যকে কেন্দ্র করে সূর্য থেকে ৯ কোটি ৩০ লক্ষ মাইল দূর দিয়ে প্রায় ৬০ কোটি মাইলের পরিধি

www.pathagar.com

বিশিষ্ট একটা ডিম্বাকার বৃত্তের চারপাশ দিয়ে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর যে ৩৬৫ দিন সময় লাগে ঐ সময়টাই হচ্ছে পৃথিবীর এক বছর কিন্তু যদি আরও বেশী সময় লাগতো তবে যতদিন সময় লাগতো ততদিনেই পৃথিবীর এক বছর হত। প্লুটোকে সূর্যের চারিপাশ দিয়ে একবার ঘুরে আসতে আমাদের বছরের ২৪৮ বছর সময় লাগে তাই তার বছর এত লম্বা।

আমরা বছরের আরও একটা হিসাব জানি। তাহল হোকবার হিসাব। সে হিসাব অনুযায়ীও আমরা দেখি আমাদের বছর ও পরকালের বছর এক নয়। [এক ওয়াক্ত নামায কাজা করলে যে ৮০ হোকবা দোযখে থাকতে হবে সে ৮০ হোকবা পৃথিবীর হিসাবে ২ কোটি ৮৮ লক্ষ বছর কিন্তু তা পরকালের হিসাবে (৮০ × ৭৫ = ৬,০০০) মাত্র ছয় হাজার বছর।]

পৃথিবী আল্লাহর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ অস্থায়ী তাই পৃথিবীকে সূর্যের চারপাশ দিয়ে ঘুরতে যে সময় লাগে সেই সময়ের হিসাবে ৫০০ বছরের কথা বলা হয়নি। বলা হয়েছে পরপারের বছরের হিসাবে। অবশ্য সেই হিসাবে ৫০০ বছর সমান আমাদের সৌর বছরের মত যে কত কোটি কোটি বছর হবে তা হিসেব করে বের করা সহজ ব্যাপার নয়। হ্যাঁ, কুরআন হাদীসের উপর গবেষণা করতে করতে একদিন এর সঠিক হিসাব হয়ত আমরা পেয়ে যেতে পারি। তবে এখন আমরা এ কথা স্পষ্ট করেই বলতে পারি যে ঐ ৫০০ বছর মানে সৌর বছরের ৫০০ বছর নয়।

বিদ্যুতে সওয়ার হওয়া কি সম্ভব?

এরপরও একটা প্রশ্ন থেকে যায় যে তা'হলে তিনি বিদ্যুতে সওয়ার হয়ে কি করে গেলেন? বিদ্যুৎ তো স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গেই মানুষ মরে যায়। এর জবাব এই যে আগুন যেমন ইব্রাহীম (আ)-কে পোড়াতে পারেনি তেমনি বিদ্যুৎ নবী (স)-কে আকর্ষণ করতে পারেনি। তাছাড়া যারা বিজ্ঞানের ছাত্র তারা জানেন যে বিদ্যুতের শক্তি যখন অত্যধিক বৃদ্ধি করা হয় তখন সে বিদ্যুতকে স্পর্শ করলে মানুষের দেহে কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে না। এটাই বৈজ্ঞানিক সত্য।

মোট কথা কোন দিক থেকেই মিরাজের কোন একটি ঘটনাকেই অযৌক্তিক বা অবৈজ্ঞানিক বলার মত কোন পথ নেই, কোন যুক্তিও নেই।

www.pathagar.com

মি'রাজ স্বশরীরে, কি স্বপ্নে?

আল্লাহ কুরআন পাকে বলেছেন–

سُبْحَانَ الَّذِىْ اَسْرٰى بِعَبْدِهٖ لَيْلاً مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اِلَى الْمَسْجِدِ الْاَقْصٰى ـ

"মহান তিনি, যিনি তাঁর বান্দাকে তাঁর নিদর্শনসমূহের কিছু দেখানোর উদ্দেশ্যে মসজিদুল হারাম (কাবাশরীফ) থেকে মসজিদুল আকসা বা দূরবর্তী (বায়তুল মুকাদ্দাস ও বায়তুল মামুর) মসজিদ পর্যন্ত নৈশ ভ্রমণ করিয়েছিলেন।"

এখানে عَبْد নামে যে শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে এ থেকে স্বপ্ন বুঝায় না। رُوْح এবং جَسَد এর সংমিশ্রণে যে জিন্দা ও জাগ্রত মানুষ হয় ঐটিকেই আরবীতে عَبْد বলা হয়। কাজেই প্রমাণ হলো যে তা স্বপ্নে ছিল না; স্বশরীরেই ছিল। উপরন্তু اَسْرٰى শব্দ থেকেও স্বশরীরে ভ্রমণ বুঝায়। (এই আয়াতের মধ্যে মসজিদুল আকসা এমন একটি শব্দ যা থেকে একই সঙ্গে দুটি স্থানকে বুঝান হয়েছে। আকসা অর্থ দূরবর্তী। বায়তুল মুকাদ্দাসও মক্কা শরীফ থেকে দূরে ছিল এবং বায়তুল মামুরও বহু দূরে সাত তবক আসমানের উপর ছিল। কাজেই আল্লাহ বাইতুল মুকাদ্দাস ও বাইতুল মামুর না বলে এক কথায় দূরবর্তী মসজিদ বলেছেন। বাহু একই কথার মধ্যে দুইটি স্থানই শামিল হয়ে গেছে।)

তাছাড়া আমরা যদি বিশ্বাস করি যে, নবী (স)-কে বিশেষ ট্রেনিং এর জন্যে ও আকাশ রাজ্যের নির্দনাবলী দেখানোর জন্যে আকাশে ডেকে নিয়েছিলেন তা'হলে কি করে বলতে পারি যে ট্রেনিং স্বপ্নে হয়? স্বপ্নে কখনই ট্রেনিং হয় না। অর্থাৎ মি'রাজ যে স্বশরীরে জাগ্রত অবস্থায় হয়েছিল এতে আর সন্দেহের কিছুই রইল না।

মিরাজ স্বশরীরে কি সম্ভব?

আল্লাহ তো সব অসম্ভব থেকে পাক। এই জন্যেই তো বলা হয়েছে তিনি سُبْحَانَ। মানুষের মনে সাধারণতঃ প্রশ্ন জাগতে পারে যে যেখানে

www.pathagar.com

অক্সিজেন নেই সেখানে মানুষ কি করে বাঁচতে পারে? এসব প্রশ্ন তাদেরই মনে জাগতে পারে যারা আল্লাহকে বাদ দিয়েই বিশ্বলোকের চিন্তা করে। আমাদের যদি এতটুকু ঈমান থাকে যে মানুষের বাঁচার জন্য যে অক্সিজেনের প্রয়োজন, সেতো আল্লাহরই ব্যবস্থা। কাজেই তিনি ইচ্ছা করলে ঐ ব্যবস্থাটাও তো রহিত করে দিতে পারেন। আল্লাহ পাক তো মানব শিশুকে মায়ের পেটে বিনা অক্সিজেনেই বাঁচিয়ে রাখেন। হয়ত এখানে মানুষ বলবে যে মায়ের নিঃশ্বাসে সন্তানের নিঃশ্বাসের কাজ হয়ে যায় কিন্তু ডিমের মধ্যে যে বাচ্চা জ্যান্ত থাকে সেগুলোর উপর মায়ের নিঃশ্বাস কোন কাজ করে কি? গত ১৮ ই ফেব্রুয়ারী (১৯৭৭) ইত্তেফাকে খবর বের হলো একটা ছেলে ৮ ঘন্টা পানির মধ্যে ডুবে ছিল কিন্তু সে মরেনি। এসব যদি এই প্রাকৃতিক নিয়মের জগতে সম্ভব হয় তবে আল্লাহর নিকট কোনটাকে অসম্ভব বলতে পারি?

পৃথিবীর এক মুহূর্তে আরশে ২ যুগ-একি সম্ভব?

'সময় চলছে আল্লাহর হুকুমে। তিনি এর চালক।" শুধু এই কথাটুকুর প্রতি ঈমান আনতে পারলেই এ কথা বুঝতে মোটেই কষ্ট হবে না, যে কি করে পৃথিবীর এক মুহূর্তে আরশে মুয়াল্লায় ২৬/২৭ বছর কেটে যেতে পারে। এখন বলুন যার হুকুমে সময় চলছে তার হুকুমে কি সময় বন্ধ হ'তে পারে না? গাড়ীর যারা চালক তারা কি শুধু গাড়ী চালানোই শেখে না কি থামানোও শেখে? দুনিয়ার গাড়ীর চালকরা যদি গাড়ী চালাতেও পারে থামাতেও পারে তবে আল্লাহ যিনি সময়ের চালক তিনি সময়কে কি শুধু চালাতেই পারেন, থামাতে কি পারেন না? হ্যাঁ অবশ্যই পারেন। শুধু তাই নয় একটা মটর ড্রাইভার গাড়ীর ইঞ্জিন চালু রেখে চাকা বন্ধ করে রাখতে পারে। এ যদি মানুষের তৈরী ইঞ্জিনের ব্যাপারে সম্ভব হয় তবে আল্লাহর জন্যে কি সম্ভব না যে আকাশের সময়কে চালু রেখে দুনিয়ার চাকা বা দুনিয়ার সময়কে বন্ধ করে রাখেন? অবশ্যই তা সম্ভব।

এখন প্রশ্ন থেকে যায় যে দুনিয়ার সময়কে কেন বন্ধ করে দেয়া হলো? এর যুক্তিগ্রাহ্য জবাব এই যে যদি দুনিয়ার সময়কে চালু রেখেই হুজুর (স)-কে ২৬/২৭ বছর আকাশে রেখে দিতেন তাহলে- (১) মূসা (আ) মাত্র ৪০ দিন তূর পাহাড়ে অবস্থান কালে তাঁর উম্মত থেকে অনুপস্থিত থাকার কারণে যে অবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার চাইতেও অনেক খারাপ

www.pathagar.com

অবস্থা সৃষ্টি হতো। এ সময়ের মধ্যে মুসা (আ)-এর উম্মতরা গরুর বাছুর পূজা করা শুরু করে দিয়েছিল। মাত্র ৪০ দিনের ব্যবধানে যদি এইরূপ অবস্থার সৃষ্টি হতে পারে তাহলে অসমাপ্ত কাজের মাঝখান থেকে ২৬/২৭ বছর অনুপস্থিত থাকার কারণে কি অবস্থা সৃষ্টি হতে পারতো চিন্তা করুন। দুনিয়ার সময়কে চালু রেখে রাসূল (স)-কে রাতের অন্ধকারে গোপনে নিয়ে ২৬/২৭ বছর আকাশে রেখে দিলে নিম্নে উল্লেখিত প্রতিক্রিয়াগুলো প্রকাশ পেতো, যথা ঃ

১. বাকী মুসলমানগণ হয় ঈমান হারাতো অথবা জীবন হারাতো।

২. লোকে বলত মুহাম্মদ (স) শেষ পর্যন্ত হয় পালিয়ে গেছেন অথবা নিহত হয়েছেন।

৩. দীর্ঘদিন পরে ফিরলে কেউ তাকে চিনতই না।

৪. চিনলেও কাজ শুরু করতে হত একেবারে শুরু থেকেই। মাঝখানের ১২ বছরের কাজের তেমন প্রভাব থাকত না।

৫. মক্কার কোরাইশ কাফের মুশরিকদের স্বপক্ষে এবং ইসলামের বিপক্ষে এমন জনমত গড়ে উঠত যে পরে আর তা খন্ডন করা সহজ হয়ে উঠত না। এই ধরনের এমন কিছু কারণ ঘটত যা ঘটতে দেয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে উচিত ছিল না। তাই হয়ত আল্লাহ পাক অত্যন্ত বিজ্ঞোচিতভাবে দুনিয়ার সময়কে বন্ধ করে দিলেন যেন নবী (স)-এর কাজের কোন অসুবিধা না হয়। অপরদিকে ইসলামের ও মুসলমানদের কোন প্রকার ক্ষতি হতে পারে- এমন কোন অবস্থার সৃষ্টি না হয়।

তাছাড়া, এমন কিছু কাজও আল্লাহ করতে পারতেন যাতে দুনিয়ার মানুষ বাধ্য হয়েই কোন অন্যায় কাজ করতে পারত না। যেমন ধরুন মিথ্যা বললে জবান বন্ধ করে দিতে পারতেন, প্রতিমার সামনে মাথা নুয়ালে আর হয়ত তার মাথাকে আল্লাহ উঁচু নাও হতে দিতে পারতেন। আকাশ থেকে হয়ত গায়েবী আওয়াজে আল্লাহ বলে দিতেন যে এইটা কর এবং ঐটা করোনা। এর কোন একটিও আল্লাহ করেননি, কারণ এই দুনিয়ার মানুষের পরীক্ষা হতে হবে যে সে তার জ্ঞানের কি সদ্ব্যবহার করেছে। আর সেই জ্ঞানের যেন সদ্ব্যবহার করতে পারে সে জন্যে নবী রাসূলগণের মাধ্যমে আল্লাহ মানুষকে পথ দেখানোর ব্যবস্থা করেছেন।

www.pathagar.com

সময় বন্ধ করলে অবস্থাটা কেমন দাঁড়ায়?

মনে করুন আল্লাহ এমন এক সময়, সময়কে বন্ধ হওয়ার হুকুম দিলেন যখন বাংলার কেউ হয়ত ভাত খাচ্ছিল, সে একমুঠো ভাত মুখে তুলে দেয়ার জন্যে হাতটা মুখের নিকট নিয়ে গেছে এবং মাথাটা কিঞ্চিৎ নীচু করে হা করে ভাত ক'টা মুখে নিতে উদ্যত হয়েছে ঠিক ঐ মুহূর্তে সময়কে বন্ধ করে দিলে সেই অবস্থায়ই ঐ লোক পড়ে থাকবে। মনে করুন কেউ পথ চলছিল, সে ব্যক্তি একটা পা মাটিতে রেখে আরেকটা পা কিছু উঁচু করেছে। সে পা-টা পরবর্তী পদক্ষেপের জন্যে এগিয়ে যাচ্ছে, এমন সময় যদি সময়কে বন্ধ হওয়ার নির্দেশ দেওয়া হয় তবে সে ঐ অবস্থায়ই পড়ে থাকবে। অর্থাৎ "সময় বন্ধ হও' হুকুম হওয়ার পূর্ব মুহূর্তে যে যে অবস্থায় ছিল সে ঠিক সেই অবস্থায় পড়ে থাকবে।

যেমন কার্যরত একদল লোকের ফটো তুলে নিলে সেই ফটোকে যে রূপ অবস্থায় দেখা যায় সময়কে বন্ধ করে দিয়ে পৃথিবীর বাইরে যেখানে সময় চালু আছে সেখান থেকে পৃথিবীকে দেখলে দেখা যাবে পৃথিবী একটা প্রাণহীন ছবির ন্যায় নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে। যদি এই অবস্থায় বহুদিন কেটে যায় তবে ঐ রূপই দাঁড়িয়ে থাকবে এ পৃথিবী ও এ পৃথিবীর সবকিছু। এরপর যখনই আল্লাহ সময়কে চলার হুকুম দিবেন তখনই সময় চলা শুরু করবে। অর্থাৎ ভাত ক'টা মুখের কাছে নিয়ে যে ব্যক্তিটি চুপচাপ বসেছিল সে ভাত ক'টা তুলে মুখে দেবে। যে যে-কাজ করতে করতে যেখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়েছিল সে সেইখান থেকেই তার পরবর্তী কাজ করতে থাকবে কিন্তু কেউ তা টের পাবে না। এই সময়ের মধ্যে কারও নখটাও বাড়বে না, চুলও লম্বা হবে না। ভুক্ত দ্রব্য যা তার পাকস্থলীতে ছিল তাও হজম হবে না। এক কথায় সময়ের মধ্যে যা ঘটে তার কিছুই ঘটবে না। আল্লাহ সময়কে বন্ধ করে দেয়ায় মি'রাজের দিন ঐ ব্যাপারটাই ঘটেছিল। হুজুরে পাক (স) মি'রাজ থেকে ফিরে এসে দেখলেন ওজুর পানি গড়িয়ে যাচ্ছে, বিছানাও গরম রয়েছে। পানিটা মাটিতে চুষতেও সময় লাগে এবং বিছানার গরমটা লোপ পেতেও সময় লাগে। কিন্তু সেই সময়ই যখন অতিবাহিত হয়নি তখন পানিই বা কি করে কোথায় যাবে আর বিছানাই বা কেমন করে ঠাণ্ডা হবে। আশা করি দুনিয়ার সময় বন্ধ হওয়ার ব্যাপারটা আর বুঝতে কারও বাকি রইল না।

www.pathagar.com

মি'রাজের অলৌকিক ঘটনার ন্যায় আল্লাহ পাক পূর্বেও কিছু ঘটনা ঘটিয়েছেন। যেমন– হযরত ইব্রাহিম (আ)-এর ব্যাপারে আগুনকে ঠাণ্ডা করা, হযরত মুসা (আ)-এর জন্যে দরিয়ার ভিতর দিয়ে রাস্তা করা, হযরত ইউনুস (আ)-কে মাছের পেট থেকে উদ্ধার করা, হযরত ঈসা (আ)-কে আকাশে তুলে নেয়া ইত্যাদি ঘটনা পূর্বেও ঘটেছে।

মি'রাজে গিয়ে কি নবী (স) আল্লাহকে দেখেছিলেন এবং তা কি সম্ভব?

এটা যদিও বিতর্কিত বিষয় অর্থাৎ কারও কারও মত যে নবী (স) আল্লাহকে দেখেছিলেন এবং কারও মত যে দেখেননি। দুটি মতেরই স্বপক্ষে যুক্তি আছে। আল-কুরআনে আল্লাহ বলেছেন–

مَا زَاغَ الْبَصَرُ وَمَا طَغٰى -

অর্থাৎ 'দেখার সময় তাঁর চক্ষুতে বক্রতা আসেনি ও দৃষ্টি ভিন্নমুখী হয়নি।' এর থেকে প্রমাণ হয় যে হযরত মূসা (আ) তুর পাহাড়ে আল্লাহর নূরের তাজাল্লি দেখে যে অবস্থায় পড়েছিলেন নবী (স)-এর ব্যাপারে সেরূপ অবস্থার সৃষ্টি হয়নি। এটা তো কালামে পাকের স্পষ্ট কথা। এরপর দেখা দরকার যে সাধারণ জ্ঞান এটাকে সমর্থন করে কি না। এখানে জ্ঞান থেকে কিছু যুক্তি দিচ্ছিঃ

১. পৃথিবীকে স্বাভাবিক নিয়মে চালাতে যখন যা প্রয়োজন হয় তখনই আল্লাহ পাক তা দেন বা করেন এবং নিষ্প্রয়োজনে কাউকে কিছু দেন বা করেন না, এটাই আল্লাহর নিয়ম। আমরা দেখি মানুষকে তার বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যে বয়সে তার যা প্রয়োজন হয় সেই বয়সে আল্লাহ তাকে তা দিতে থাকেন। যেমনঃ যখন দাঁতের দরকার থাকে না তখন কাউকেই আল্লাহ দাঁত দেন না কিন্তু যখনই দাঁতের প্রয়োজন হয় তখন প্রত্যেককেই দাঁত দেন। আবার বয়সের যে স্তরে তার ক্রীড়া প্রবৃত্তি প্রয়োজন তখন ক্রীড়া প্রবৃত্তি দেন, তখন তার মন খেলাধুলা করতে ভালবাসে। এইভাবে বয়সের স্তরভেদে তার মধ্যে একে একে আসতে থাকে আত্ম প্রবৃত্তি, আত্ম প্রতিষ্ঠা প্রবৃত্তি, যৌন প্রবৃত্তি ইত্যাদি প্রবৃত্তিগুলো। আবার দেখি আল্লাহ তাঁর খাস বান্দাদের ব্যাপারে প্রয়োজনের তাগিদে নিয়মের বাইরেও কিছু দেন। যেমন ঃ মুসা (আঃ)-এর জন্যে দরিয়ার ভিতর দিয়ে রাস্তা করে দেয়া এবং এই

www.pathagar.com

ধরনের আরও বহু ঘটনা যা আমাদের জানা আছে, সেগুলোও প্রয়োজনের তাগিদেই আল্লাহ করেছিলেন।

২. আর এ কথার উপর আমাদের প্রত্যেকেরই ঈমান আছে যে- আল্লাহর কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। আল্লাহ তাঁর নবীকে উর্ধ্ব লোকে নিয়ে যদি তাঁকে (আল্লাহকে) দেখার মত শক্তি দেন তবে তা অসম্ভবের কিছুই না। হ্যাঁ, তবে এখানে প্রশ্ন আসে যে- আল্লাহ যখন কোন বস্তু নন এবং তিনি কোন চেহারা বা আকার বিশিষ্ট কোন কিছু নন তখন তাকে কি করে দেখা যাবে? এ প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর এই যে, আল্লাহ এখন যেমন আছেন কিয়ামতের দিনও তেমনই থাকবেন। কিন্তু সেদিন বিচারের সময় প্রত্যেকেই আল্লাহকে দেখবেন এতে কারও দ্বিমত নেই। তাহলে সেদিন কি করে দেখা সম্ভব হবে? সেদিন যে প্রয়োজনের তাগিদে মানুষকে আল্লাহ দেখা দিবেন (অর্থাৎ মানুষের সঙ্গে যেহেতু কথা বলা লাগবে, তাই দেখা দেয়ারও প্রয়োজন হবে) সেই একই প্রয়োজনে মি'রাজে যখন নবী (স)-এর সঙ্গে আল্লাহ সরাসরি কথা বলেছেন, তখন দেখা দেয়াটা একেবারে যুক্তি বিরোধীও বলা যায় না। যারা বলেন, 'পর্দার আড়াল থেকে কথা বলেছিলেন, তাদের কিন্তু পর্দার ব্যাখ্যা দেয়া লাগে। পর্দার আড়ালের অর্থ কি এই যে, তখন পর্দার এক পার্শ্বে আল্লাহ ছিলেন আর অন্য পার্শ্বে ছিলেন না? বিশেষ আয়তনের কোন কিছু পর্দার আড়ালে থাকতে পারে কিন্তু আল্লাহ কি করে পর্দার আড়ালে থাকেন? তাও না হয় থাকলেন কিন্তু দেখাও যে সম্ভব সেটাও তো আকীদা ও যুক্তি বিরোধী নয়। মানুষ চোখ দিয়ে যে দেখে, এই দেখার মালিক কিন্তু চোখ নয়। চোখই যদি দেখার খোদ মালিক হ'তো তাহলে ঘুমন্ত মানুষের চোখের পাতা ফাঁক করে তার চোখের সামনে কোন কিছু ধরলে সে কি তা দেখতে পায়? জাগলে কি সে বলতে পারে যে তার চোখের সামনে কি ধরা হয়েছিল? তা সে বলতে পারে না, কারণ দেখার মালিক চোখ নয়? মালিক রূহ। মানুষের রূহের মধ্যেই দৃষ্টিশক্তি; চোখ তার মাধ্যম মাত্র। আর দৃষ্টিশক্তির একটা যুক্তিসঙ্গত আওতা আল্লাহ ঠিক করে দিয়েছেন। যা দেখলে মানুষের ক্ষতি হবে তা মানুষের দৃষ্টিশক্তির পরিসীমার বাইরে রেখেছেন। আর যা দেখা প্রয়োজন, তা-ই মানুষের দৃষ্টিশক্তির আওতার মধ্যে রেখেছেন– যেমন, বায়ু, বিভিন্ন গ্যাসীয় পদার্থ ও জ্বীন ইত্যাদি ধরনের জিনিসগুলোকে আল্লাহ দৃষ্টিশক্তির আওতার বাইরে রেখেছেন। চিন্তা করুন বায়ু যদি দেখার মত

www.pathagar.com

কোন বস্তু হত তাহলে পানিতে ডুব দিলে যেমন পানি চোখের উপর এসে আড়াল করে তেমন বায়ুও পানির ন্যায় চোখের উপর এসে এমন আড়াল করত যে, মানুষ বায়ু ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেতো না। কাজেই মহান দয়ালু আল্লাহ মানুষের প্রয়োজন মিটানোর জন্যে দরকার মুতাবিক দৃষ্টিশক্তির একটা আওতা ঠিক করে দিয়েছেন। মানুষের দৃষ্টি শক্তি তার রূহে, চোখ শুধু মাত্র মাধ্যম। এই 'মাধ্যম' এর আওতা থেকে দৃষ্টিশক্তিকে বের করে নিলে সে শক্তি তখন মাধ্যম বিহীন শুধু শক্তিতে পরিণত হয়। সে তখন মাধ্যম ছাড়াই দেখে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে দৃষ্টিশক্তির আওতা বৃদ্ধিও করে দিতে পারেন এবং তা দিয়েও থাকেন। যেমন নবী (স) ফেরেশতা দেখেছেন কিন্তু অন্যরা দেখেননি। তিনি ইবলিসকেও দেখেছেন, ইবলিসের সঙ্গে কথা বলেছেন কিন্তু সাধারণে তা দেখেনি। এতে স্পষ্ট প্রমাণ হলো যে হুজুরে পাক (স)-এর দৃষ্টি শক্তির আওতা সাধারণের চাইতে বেশী ছিল। আর তা ছিল এই বস্তু জগতেই আর বস্তু জগতে যার জন্যে দৃষ্টিশক্তির আওতা আল্লাহ পাক বৃদ্ধি করে দিলেন তাঁর দৃষ্টি শক্তির পরিসীমা কি বিশেষ প্রয়োজনে আরও বৃদ্ধি করে দিতে পারেন না? তা অবশ্যই পারেন। অতএব, প্রমাণ হলো যে আল্লাহকে দেখা নবীর জন্যে অসম্ভব ছিল না। তবে আমি একথা বলছি না যে তিনি আল্লাহকে স্বচক্ষে দেখেছেনই এবং একথাও বলছি না তিনি দেখেননইনি। আমি মনে করি আল্লাহর জন্যে উভয় অবস্থাই সম্ভব।

শেষ বিচারের পূর্বে দোযখে লোক দেখা কি সম্ভব?

শেষ বিচারের পূর্বে কেউ দোযখে যাবে না, এ কথাও ঠিক এবং নবী (স) দোযখে লোক দেখেছেন এ কথাও ঠিক; কিন্তু কথাটি শুনতে পরস্পর বিরোধী বলে মনে হচ্ছে। এটা যে সম্ভব তা যুক্তি এবং উদাহরণ সহকারে বুঝাব ইনশাআল্লাহ।

দেখুন, আমরা যে তিনটি কালের কথা বলে থাকি তার অতীত ও ভবিষ্যত কাল মানুষের জন্যে আর সবটা বর্তমান কাল আল্লাহর জন্যে। আমরা যেটাকে বর্তমান কাল বলি সেটা প্রকৃতপক্ষে অতীত ও ভবিষ্যত কালের মধ্যে পার্থক্য সৃষ্টিকারী একটি চলমান সময় রেখা মাত্র। আর আল্লাহর নিকট কোনটাই অতীত নয় ও কোনটাই ভবিষ্যত নয়। অতীতও যেমন আল্লাহর চোখের সামনে ভবিষ্যতও তেমন আল্লাহর চোখের সামনে।

www.pathagar.com

যেমন সিনেমার ফিল্মে যে ছবিটা উঠান হয় তা প্রথমবার পর্দার উপর দেখানোর পূর্বেও যেমন ফিল্মে থাকে তেমন ছবিটা সিনেমার হলে দেখানোর পরেও ঠিক তেমনই ফিল্মের মধ্যে বর্তমান থাকে। যারা কোন একটা বই প্রথমে কোন সিনেমা হলে প্রথম বারের মত দেখা শুরু করে তখন কিছুটা দেখার পরে সামনে আর কি দেখবে তা দর্শকরা বলতে পারে না কিন্তু ফিল্মটা যিনি তৈরী করেছেন এবং যিনি তা দেখাচ্ছেন তিনি অবশ্যই জানেন যে তিন ঘন্টা ধরে কি কি ছবি পর্দার উপর দেখান হবে। সিনেমার একটা কাহিনী যেমন প্রথম মুক্তি লাভের পূর্বেও ফিল্মের প্রস্তুতকারক তার কোন বন্ধুকে দেখাতে পারেন এবং তা দেখালে যেমন সাধারণ লোকের দেখার বহু পূর্বেই তিনি বলে দিতে পারেন যে অমুক বইটার মধ্যে এই এই ঘটনা আছে। এইটা যেমন সম্ভব ঠিক তেমনই আল্লাহর জন্যে সম্ভব যা বহু বহু পরে ঘটবে তা ঘটার পূর্বে হুবহু তা-ই তার প্রিয় নবীকে দেখান। আল্লাহর জন্যে কোন কিছুই অসম্ভব নয়।

মি'রাজের প্রকৃত শিক্ষা

হুজুরে পাক (স) আল্লাহর দরবার থেকে শিখে আসলেন সেই সব আইন ও নিয়ম-কানুন যা তিনি পরবর্তীকালে বাস্তবায়িত করলেন মুসলিম সমাজে। ফলে সমাজ থেকে দূর হলো যাবতীয় অন্যায় ও পাপ এবং সমাজে কায়েম হলো এক বেহেশতি শান্তি। তিনি উর্ধ্বলোক থেকে যে প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে এসেছিলেন তার যে টুকু আমাদের জানা দরকার তাই আল্লাহ তার বান্দার প্রতি নাযিল করেছেন। এই কথাটা আল-কুরআনে আল্লাহ এইভাবে বলেছেন যে, فَاَوْحٰى اِلٰى عَبْدِهٖ مَا اَوْحٰى (তাঁর বান্দার প্রতি নাযিল করলেন যা নাযিল করা দরকার) এর থেকে বুঝা গেল, মি'রাজের পুরা আলোচনা আমাদেরকে জানানো হয়নি। হয়েছে মাত্র ততটুকুই যতটুকুর মধ্যে আমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। এসব কথাগুলো সূরা বনি ইসরাঈলের মধ্যে ধারাবাহিক ভাবে আল্লাহ বলেছেন।

সেখানে বলা হয়েছে বনি ইসরাঈলদেরকে নেতৃত্ব দিয়ে তা কেড়ে নেয়া হয়েছিল যে ধরনের অপরাধের জন্য, সেই ধরনের অপরাধ যেন আমাদের দ্বারা না হয়, তা স্পষ্ট করে বলা হয়েছে এই সূরার ১ম ও ২য় রুকুতে। সেখানে যেসব অপরাধের কথা বলা হয়েছে অর্থাৎ বনি ইসরাঈল সম্প্রদায় যে কারণে পথ ভ্রষ্ট হয়েছিল সেই সব কারণে বা সেই সব বাঁকা পথ ধরে

www.pathagar.com

যেন উম্মতে মোহাম্মদী পথ ভ্রষ্ট না হয় এবং যেন আল্লাহর নবী পূর্বাহ্নেই সেই সব পথগুলো বন্ধ করে দিতে পারেন তার জন্যে যেসব বিষয়ের পূর্বজ্ঞান ও অভিজ্ঞতা দরকার ছিল তা নবী (স)-কে শেখানো হয়েছিল খুবই গুরুত্ব সহকারে; কারণ পথ ভ্রষ্ট হওয়া থেকে উম্মতকে বাঁচানই ছিল সর্বাধিক জরুরী কাজ।

তাই শিখিয়ে দেয়া হয়েছিল এমন ১৪টি মূলনীতি যার উপর একটা ইসলামী রাষ্ট্রের (খেলাফতের) ভিত্তি স্থাপন করতে পারেন। প্রকৃতপক্ষে এ ধারাগুলো (১৪টি) হচ্ছে একটি আদর্শ কল্যাণ রাষ্ট্রের কাঠামো। যদি কোন রাষ্ট্র এই দফাগুলোকে তার রাষ্ট্রীয় কাঠামো হিসাবে মেনে নেয় আর সে দফাগুলোর শিক্ষা যদি সত্যিকার ভাবে সেই রাষ্ট্রে কায়েম করে তাহলে অবশ্যই সে রাষ্ট্রে আর এমন কোন চোরা পথই খোলা থাকে না যে পথ ধরে সেখানে অশান্তি ঢুকতে পারে।

শান্তি প্রতিষ্ঠার ১৪ দফা মূলনীতি

১. وَقَضٰى رَبُّكَ اَلَّا تَعْبُدُوْٓا اِلَّآ اِيَّاهُ

"তোমার প্রভুর সিদ্ধান্ত যে তোমরা একমাত্র আল্লাহ ছাড়া আর কারও দাসত্ব, আনুগত্য ও উপাসনা করবে না।"

ব্যাখ্যা- মানুষের এটা ফিতরাত বা সহজাত প্রবৃত্তি যে মানুষ যাকেই প্রভু বা সর্বময় ক্ষমতার মালিক বলে মনে করে তারই নিকট মাথা নত করে এবং তারই হুকুম মানে ও তারই আনুগত্য করে। কিন্তু এ হুকুম মানা ও আনুগত্য করা যদি আল্লাহ ছাড়া আর কারও জন্যে হয়ে যায় তবে ইহকালেও দুর্ভোগের সীমা থাকে না, পরকালেও জাহান্নামে যাওয়া ছাড়া আর কোন উপায় থাকে না। তাই সর্বপ্রথম এই গুরুত্বপূর্ণ ধারাটির কথা আল্লাহ উল্লেখ করলেন। এখানে মানুষকে বুঝান হচ্ছে– যে জীবনে যখন কোন না কোন ব্যবস্থা মেনে চলতেই হবে তখন সে ব্যবস্থা আল্লাহর দেয়া বিধানই মেনে চলবে এবং কারও না কারও দাসত্ব যখন করতেই হবে তখন সে দাসত্ব আল্লাহরই করবে আর আনুগত্যও যখন কারও না কারও করতেই হবে তখন সে আনুগত্যটাও আল্লাহরই হতে হবে। উপরোক্ত আয়াত থেকে যে নির্দেশ পাওয়া যাচ্ছে তাকে এক কথায় বলতে হলে বলতে হবে এই যে, মানুষের সামগ্রিক জীবন ব্যবস্থা হতে হবে আল্লাহর আনুগত্য, দাসত্ব ও উপাসনার ভিত্তিতে।

www.pathagar.com

٢ - وَبِالْوَالِدَيْنِ اِحْسَانًا ط اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِنْدَكَ الْكِبَرَ اَحَدُهُمَا اَوْ كِلٰهُمَا فَلَاتَقُلْ لَّهُمَا اُفٍّ وَّلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيْمًا * وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُلْ رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيٰنِىْ صَغِيْرًا * رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا فِىْ نُفُوْسِكُمْ ط اِنْ تَكُوْنُوْا صٰلِحِيْنَ فَاِنَّهٗ كَانَ لِلْاَوَّابِيْنَ غَفُوْرًا *

" আর পিতা-মাতার সাথে ভাল ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন অথবা দুইজনই বৃদ্ধ অবস্থায় বেঁচে থাকেন তবে তাদের সাথে উঁহ শব্দটা পর্যন্ত করবে না। তাদের তুচ্ছ জ্ঞান করে ধমক দিয়ে কথা বলবেনা, তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় কথা বলবে। তাদের সামনে যাবে অত্যন্ত বিনম্রভাবে ও দয়ার্দ্র চিত্তে আর বলবে হে প্রভু! তাদেরকে সেইরূপ প্রতিপালন কর যে রূপে তারা আমাদেরকে ছোট বেলায় লালন পালন করেছিলেন। তোমার প্রভু তোমার অন্তরের খবর রাখেন। তোমরা যদি সৎ হয়ে যাও তবে জেনে রেখ আল্লাহ্ প্রার্থনাকারীর প্রার্থনা মঞ্জুর করেন।"

ব্যাখ্যা - পারিবারিক শান্তির জন্য প্রয়োজন পরিবারের প্রধান হিসাবে পিতাকে মেনে নেয়া এবং পিতা-মাতার অধিকার সন্তান-সন্ততির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করা। তাদের বৃদ্ধাবস্থায় অত্যন্ত দায়িত্বানুভুতি সহকারে তাদের সেবা-যত্ন করবে এবং মনে রাখবে তাঁরা তোমাদের যেমন কষ্ট করে লালন পালন করেছেন ঠিক তোমরাও তাদের প্রতি তেমন আচরণ করবে আর আল্লার নিকট তাদের জন্য দোয়া করতে থাকবে। "রাব্বির হামহুমা কামা রাব্বাইয়ানী ছাগীরা।" এই নীতির উপরই নির্ভর করে পারিবারিক জীবনের সুখ-শান্তি।

এখানে মনে রাখতে হবে যে আল-কুরআন শুধু মুসলমানদের উদ্দেশ্যে নয়, এ হচ্ছে গোটা বনি আদমের উদ্দেশ্যে। তাই এই ২য় দফার শেষ আয়াতের মধ্যে ইঙ্গিত রয়েছে তাদের জন্যে যারা বৃদ্ধ পিতা-মাতার বিরক্ত থেকে বাঁচার জন্যে তাদের মৃত্যু কামনা করে আর যারা তাদের দেশের তামাম বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের নদীতে ডুবিয়ে মারাকেই রাষ্ট্রের জন্যে কল্যাণকর মনে করে তাদেরকে বলা হচ্ছে যে তোমরা যদি সৎ হয়ে যাও অর্থাৎ তোমাদের ঐ নীতি ত্যাগ করে যদি ইসলামী নীতির অনুসারী হও তাহলে তোমাদেরকেও ক্ষমা করা হবে।

www.pathagar.com

মনে রাখবেন, বিশ্বের কম্যুনিষ্ট দেশগুলোরই মনোভাব ঐ রূপ। তারা মনে করে বৃদ্ধরা একটা অযথা বোঝা মাত্র।

وَاٰتِ ذَا الْقُرْبٰى حَقَّهٗ وَالْمِسْكِيْنَ وَابْنَ السَّبِيْلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيْرًا

"আপন আত্মীয় স্বজনদের হক (পাওনা) বুঝিয়ে দাও এবং মিসকিন ও পথিকদেরও হক বুঝিয়ে দাও। আর অন্যায় ভাবে অর্থ ব্যয় করো না।"

ব্যাখ্যা- এখানে দেশের প্রত্যেকটি নাগরিককে মানবীয় সহানুভুতির মর্যাদা রক্ষা করে চলতে বলা হয়েছে। বলা হয়েছে, আত্মীয় স্বজন, গরীব মিসকিন, অসহায়, দুর্বল ও পথিকদের অভাব মোচন করতে হবে। একটা দেশের কোন একটি প্রাণীও যেন নিজেকে অসহায় মনে না করে সেদিকে কড়া দৃষ্টি রাখতে হবে, নইলে পরকালে উদ্ধার নেই। আর বলা হয়েছে অর্থ সম্পদ অপব্যয় করবে না। ব্যয় করবে আল্লাহর দেয়া নির্দ্ধারিত পন্থায়।

اِنَّ الْمُبَذِّرِيْنَ كَانُوْٓا اِخْوَانَ الشَّيٰطِيْنِ وَكَانَ الشَّيْطٰنُ لِرَبِّهٖ كَفُوْرًا * وَاِمَّا تُعْرِضَنَّ عَنْهُمُ ابْتِغَآءَ رَحْمَةٍ مِّنْ رَّبِّكَ تَرْجُوْهَا فَقُلْ لَّهُمْ قَوْلًا مَّيْسُوْرًا *

যারা বেহুদা খরচ করে তারা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভুর সঙ্গে বিদ্রোহকারী। তোমার প্রভুর নিকট থেকে তোমার কাছে রুজি আসার সময় পর্যন্ত যদি তোমাকে অপেক্ষা করতে হয় আর তার কারণে যদি কাউকে তোমার ফিরিয়ে দিতে হয় তবে তাদের সঙ্গে অত্যন্ত বিনয়ের সাথে কথা বল।"

ব্যাখ্যা ঃ অর্থের নিরঙ্কুশ মালিকানা মানুষের নয়, আল্লাহর। আল্লাহ তা যে ভাবে খরচ করতে বলেছেন মানুষ যেন তার ব্যতিক্রম না করেন। আয়, ব্যয়, সঞ্চয় এ সবই হবে আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক। অর্থের অপচয় বন্ধ করতে হবে। নিজের আয়েশ আরামের জন্য অপরের পাওনা বুঝিয়ে না দিয়ে নিজে তা আত্মসাৎ করতে পারবে না। গান-বাজনা কিংবা পাপ কাজ ও চরিত্র ধ্বংসকারী কাজে এক কপর্দকও খরচ করার অধিকার কারও নেই। অন্যায় ও অবৈধ ভোগ বিলাস বন্ধ কর। অবৈধ আয় ও ব্যয়ের যাবতীয় পথকে বন্ধ কর এবং সমাজের প্রত্যেকের বৈধ উপার্জনের পথকে

www.pathagar.com

উন্মুক্ত করে দাও। চরিত্রহীন কার্যকলাপে অর্থ ব্যয়ের প্রবণতা সমাজ জীবন হতে নির্মূল করে দাও। এইভাবে সমাজে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা নিশ্চিত কর।

وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُوْلَةً اِلٰى عُنُقِكَ وَلَاتَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ فَتَقْعُدَ مَلُوْمًا مَّحْسُوْرًا*

"তোমার হাতকে না একেবারে ঘাড়ের সঙ্গে বেঁধে ফেলবে আর না একেবারে খুলে দিবে। (বখিলও হয়ো না এবং অমিতব্যয়ীও হয়ো না) জানবে, যারা অমিতব্যয়ী তাদেরকে একদিন অনুতপ্ত হতে হবে।

ব্যাখ্যা- মানুষকে এখানে কৃপণ হতে নিষেধ করা হয়েছে। কৃপণের অর্থে অন্যে উপকৃত হতে পারে না এবং অমিতব্যয়ীও হতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন। কারণ এতে অর্থনৈতিক মেরুদণ্ড একেবারেই ভেঙ্গে পড়ে। আয়ের সঙ্গে ব্যয়ের সামঞ্জস্য বিধান করতে হবে, তা ব্যক্তিগত পর্যায়েই হোক কিংবা রাষ্ট্রীয় পর্যায়েই হোক অপব্যয়ের যাবতীয় পথকে বন্ধ করতে হবে। অবশ্য অপরিহার্য প্রয়োজনের ক্ষেত্রে ব্যয়ও করতে হবে।

اِنَّ رَبَّكَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ وَيَقْدِرُ ط اِنَّهٗ كَانَ بِعِبَادِهٖ خَبِيْرًا بَصِيْرًا ـ

"অবশ্য রিযিক বন্টনের ব্যাপারে কাউকে কিছু বেশী ও কাউকে কিছু কম দিয়েছেন। কারণ এর মধ্যে বান্দার জন্যে এমন কিছু কল্যাণ রয়েছে যা সুক্ষ্মদর্শী আল্লাহই তার খবর রাখেন।

ব্যাখ্যা - রিযিক বন্টনের ব্যাপারে আল্লাহ পাক যে স্বাভাবিক পার্থক্যের ব্যবস্থা রেখেছেন তা সামগ্রিকভাবে মানব জাতির কল্যাণের জন্যেই রেখেছেন। এটাকে অস্বাভাবিকভাবে সমান করতে যেও না। আল্লাহর দেয়া রিযিক বন্টনের নিয়মের মধ্যেই মানব জাতির সমূহ কল্যাণ। এই নীতিমালার ৩, ৪ ও ৫ নং যে নীতি দেয়া হয়েছে তা মেনে চললে কেউ রাতারাতি অর্থের পাহাড়ও গড়তে পারবে না এবং কেউ পথের ভিখারীও হয়ে যাবে না। পৃথিবীর সমাজকে চালু রাখতে হলে কুলি-মজুর, মুচি-মেথর, কবি-সাহিত্যিক, উজির-নাজির, বুদ্ধিজীবি আইনজীবি সবই প্রয়োজন আছে এবং এদের মধ্যে যতটুকু ব্যবধান আল্লাহ রেখেছেন তা

www.pathagar.com

জোর করে মিটাতে পারবে না। কাজেই তা করতে যেওনা। মনে রাখবে উজির-নাজির ও মেথর-ঝাড়ুদার কখনও এক সমান করা যাবে না। কাজেই ঐ ধরনের অবৈজ্ঞানিক পন্থায় সমাজে শান্তি আনার চেষ্টা করবে না। এটা করতে গেলে উজিরের ঘর উজিরকেই ঝাড়ু দিতে হবে। তেমন ময়লাও নিজেকে পরিষ্কার করে নিতে হবে। এটা কোন বৈজ্ঞানিক সমাজ-ব্যবস্থা নয়।

وَلَا تَقْتُلُوْٓا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ ط نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ ط اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْاً كَبِيْرًا*

"গরীব হয়ে যাওয়ার ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদেরকে মেরে ফেল না। আমি তাদেরকেও রুজি দেব এবং তোমাদেরকেও রুজি দেব। নিশ্চয়ই সন্তান হত্যার কাজ খুবই গুরুতর অপরাধের কাজ।"

ব্যাখ্যা- রিজিকের মালিক আল্লাহ। বংশবৃদ্ধিতে খাদ্যে কোন সমস্যা সৃষ্টি করে না। এ ব্যাপারে সম্পূর্ণ আল্লাহর উপর আস্থাবান হয়ে আমাদের রুজির সন্ধান করতে হবে। সন্ধান করলে সমুদ্রের ভিতর থেকেও মানুষের আহারের ব্যবস্থা আল্লাহ করে দিতে পারেন।১

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ط وَسَآءَ سَبِيْلًا

"এবং তোমরা ব্যভিচারের নিকটবর্তী হয়ো না। অবশ্যই তা অশ্লীল কাজ এবং ধ্বংসের পথ।"

ব্যাখ্যা- যেনা বা ব্যভিচার অত্যন্ত জঘন্যতম অপরাধ। এ অপরাধে

১। এ কথা ঠিক যে বাংলাদেশে লোক বসতি অন্য দেশের তুলনায় অনেক বেশী। আমাদের সরকার যদি আগ্রহী মন নিয়ে চেষ্টা করেন তাহলে বাড়তি জন সংখ্যাকে বাড়তি জন শক্তিতে বা জন সম্পদে পরিণত করতে পারেন এবং এই জনশক্তি বৈদেশিক মুদ্রা অর্জনেরও একটা মাধ্যম হতে পারে। এ ছাড়াও বাংলাদেশে এমন অনেক কাঁচামালের প্রাচুর্য্য রয়েছে যা দ্বারা বড় বড় কলকারখানা গড়ে তোলা যায় এবং সেই সব কলকারখানায় আমাদের দেশের বাড়তি জনশক্তি কাজে লাগান যায়। এসব চিন্তা ভাবনাকে বাদ দিয়েই আমরা আল্লাহর দেয়া জন সম্পদকে বাড়তি বা অহেতুক মনে করছি। এটা কি ঠিক হচ্ছে?

এ ছাড়াও আমাদের মনে রাখতে হবে যে আল্লাহর সৃষ্টিকে নিয়ন্ত্রণ করার দায়িত্ব আল্লাহরই। আর কোন মানুষের একথা মনে করার কোন অধিকার নেই যে, সে আল্লাহকে অবিবেচক মনে করতে পারে।

www.pathagar.com

সমাজ অসভ্য হয়ে ওঠে। কাজেই এই ধরনের পাপ যে যে মাধ্যমে সৃষ্টি হয় সেই সকল অশ্লীল পথগুলোকে বন্ধ করে দাও। নারী ও পুরুষের অবাধ মেলামেশা, অশ্লীল ছায়াছবি, নাচগান, সহশিক্ষা, মেয়েদের বে-পর্দা চলাফিরা ইত্যাদি চরিত্র ধ্বংসকারী পন্থাগুলো চিরতরে বন্ধ করে দাও।

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِىْ حَرَّمَ اللّٰهُ اِلَّا بِالْحَقِّ ط وَمَنْ قُتِلَ مَظْلُوْمًا فَقَدْ جَعَلْنَا لِوَلِيِّهٖ سُلْطٰنًا فَلَا يُسْرِفْ فِى الْقَتْلِ ط اِنَّهٗ كَانَ مَنْصُوْرًا *

জাতি ধর্ম নির্বিশেষে তোমরা এই আদেশ মেনে চলবে যে "কেউ কাউকে হত্যা করবে না।" কারণ মানুষের জীবন আল্লাহর নিকট অতি পবিত্র। তাই লোক হত্যা তিনি হারাম করেছেন। কিন্তু কেউ বিচারে মৃত্যুদণ্ডের উপযোগী হলে তাকে হত্যা করায় কোন দোষ নেই। নিহত ব্যক্তির আত্মীয়-স্বজন যেন হত্যাকে অবলম্বন করে বাড়াবাড়ি না করে, কারণ বিচার তার স্বপক্ষে রয়েছে।"

ব্যাখ্যা- এই নির্দেশে লোকহত্যা নিষিদ্ধ হয়ে গেছে, গুপ্তহত্যা, বিনা বিচারে হত্যা বা বিচার নিজের হাতে তুলে নেয়ার পথকে বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। আর বন্ধ করা হয়েছে একটা হত্যাকে মূলধন করে ভাল লোকদেরকে আসামী করে অযথা লোক হয়রানির পথকে। এখানে বলা হয়েছে ন্যায় বিচারের ফায়দা বাদী পক্ষেরই পাওনা। কাজেই এ নিয়ে বাড়াবাড়ি করে ভাল লোকদেরকে হয়রানি করোনা এবং বিচারকে উপেক্ষা করে প্রতিশোধের রীতি চালু রেখ না।

وَلَا تَقْرَبُوْا مَالَ الْيَتِيْمِ اِلَّا بِالَّتِىْ هِىَ اَحْسَنُ حَتّٰى يَبْلُغَ اَشُدَّهٗ ـ

"কখনও এতিমের মাল স্পর্শ করো না। কিন্তু এতিম যতক্ষণ পর্যন্ত জ্ঞানবুদ্ধিসম্পন্ন হওয়ার মত বয়সে না পৌঁছে ততদিন পর্যন্ত তার সম্পত্তির দেখাশুনা করা উত্তম।"

ব্যাখ্যা - নিকট আত্মীয়দের মধ্যে কেউ এতিম হলে তারা যতদিন না বালেগ হয় বা নিজেরা দেখেশুনে সংসার চালাতে সক্ষম হয় ততদিন তাদের এক কপর্দকও নিজে ভোগ করবে না।

www.pathagar.com

وَاَوْفُوْا بِالْعَهْدِ اِنَّ الْعَهْدَ كَانَ مَسْئُوْلاً *

"ওয়াদা চুক্তি ও অঙ্গীকার পূরণ করবে। অবশ্যই চুক্তি সম্পর্কে মানুষ জিজ্ঞাসিত হবে।"

ব্যাখ্যা-ওয়াদা বা চুক্তি তা ব্যক্তিগতই হোক আর রাষ্ট্রীয় বা আন্তর্জাতিক পর্যায়েরই হোক- যে কোন চুক্তিই হোক না কেন তা অবশ্যই মেনে চলতে হবে ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ অপর পক্ষ চুক্তি ভঙ্গ না করে। আর কখনই মুনাফেকীর নীতি অবলম্বন করবে না। এছাড়া عَهْد থেকে এটাও বুঝায় যে প্রতিটি মানুষই কোন না কোন দায়িত্ব পালন করে থাকে, এগুলোও عَهْد এর মধ্যে শামিল। অর্থাৎ পরকালে এটাও প্রশ্ন করা হবে যে যার যা দায়িত্ব ছিল তা সে পালন করেছে কিনা, অর্থাৎ ঝাড়ুদার থেকে রাষ্ট্রপ্রধান পর্যন্ত প্রত্যেককে প্রশ্ন করা হবে যে তারা কি তাদের নিজ নিজ দায়িত্ব ঠিক মত পালন করেছে?

وَاَوْفُوا الْكَيْلَ اِذَا كِلْتُمْ وَزِنُوْا بِالْقِسْطَاسِ الْمُسْتَقِيْمِ ط ذٰلِكَ خَيْرٌ وَّاَحْسَنُ تَاْوِيْلاً *

"যখন পাত্র দ্বারা মাপবে তখন পুরা মাপবে এবং সঠিক ও ত্রুটিহীন পাল্লায় উচিতভাবে ওজন করবে এবং বন্টন করার ক্ষেত্রে ন্যায় ভিত্তিক করবে। এইটাই সঠিক পদ্ধতি। আর এ ব্যবস্থা অত্যন্ত ভাল ব্যবস্থা। (জাতীয় সম্পদের বন্টন ব্যবস্থা ন্যায় ভিত্তিক হতে হবে।)

وَلاَتَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهٖ عِلْمٌ ط اِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ اُولٰئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُوْلاً *

"যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নাই তার উপর অমুলক ধারণার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ কোন কাজ করবে না। নিশ্চয়ই তোমার শ্রবণশক্তি, দৃষ্টি শক্তি ও চিন্তাশক্তির ব্যবহারের ব্যাপারে তুমি জিজ্ঞাসিত হবে।"

ব্যাখ্যা - অমূলক ধারণার বশবর্তী হয়ে হঠাৎ কোন কাজ করে বসলে তাতে কোন বিপর্যয় সৃষ্টি হতে পারে। তাছাড়া অনেক সময় শুধুমাত্র

www.pathagar.com

ধারণার বশবর্তী হয়ে ভাল লোকদের শাস্তি দেয়া হয় কখনও বা অযথা হয়রান করা হয়। কখনও ধারণা ও সন্দেহকে প্রমাণ হিসাবে খাড়া করা হয়। এটা খুবই দোষণীয়। মনে রাখবে এই ধরনের কাজের জন্য অবশ্যই জবাবদিহি করতে হবে। আর কখনও অহিভিত্তিক জ্ঞান ছাড়া অন্য কোন জ্ঞানকে সঠিক বলে মনে করবে না।

وَلَا تَمْشِ فِى الْاَرْضِ مَرَحًا ج اِنَّكَ لَنْ تَخْرِقَ الْاَرْضَ وَلَنْ تَبْلُغَ الْجِبَالَ طُوْلًا *

"যমীনের উপর দিয়ে কখনও গর্ব করে চলাফেরা করো না। (তোমরা পদভারে) যমীন ফাড়তে পারবে না এবং পাহাড়ের সমান উঁচুও হতে পারবে না।"

ব্যাখ্যা- ইয়াহুদি নাসারাদের ন্যায় তোমরা দাম্ভিক হয়ো না। যমীনের উপর দিয়ে গর্ব ও দম্ভ ভরে চলাফেরা অত্যন্ত খারাপ কাজ। অন্যান্য জাতি যারা ইতি পূর্বে ধ্বংস হয়েছে তারা ঐ দোষেই ধ্বংস হয়েছে যে তারা দাম্ভিক ছিল, আর ছিল তাদের অন্তরে বক্রতা। তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ পাক বলছেন যে তোমরা যতই দম্ভ ভরে চলাফেরা করনা কেন তোমাদের মাথা পাহাড়ের সমান হতে পারবে না আর পায়ের ভারে মাটিকে ফাটাতে কোন দিনও পারবে না। কাজেই দম্ভ, গর্ব, অহংকার, হিংসা, বিদ্বেষ এগুলো ছাড়।

এইবার চিন্তা করুন যদি এ পৃথিবীর কোন রাষ্ট্রে এসব ধারাগুলোকে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করা হয় তাহলে আর কি এমন কোন চোরা পথ খোলা থাকে যে পথ ধরে সমাজে অশান্তি ঢুকতে পারে?

মিরাজে গিয়ে তিনি কি দেখলেন এবং কেন তা দেখান হলো?

لِنُرِيَهٗ مِنْ اٰيٰتِنَا 'আমার কিছু নিদর্শনাবলী দেখানোর উদ্দেশ্যে তাঁকে উর্ধ্বলোকে ডেকে নিলাম" এখানে প্রশ্ন জাগে যে কি দেখাবেন এবং কেন দেখাবেন? এর জবাব তাঁর থেকেই পাওয়া যায় যাকে তিনি দেখালেন।

www.pathagar.com

তিনি দেখালেন যে মিরাজের শিক্ষা মুতাবিক যদি সমাজে পূর্ণাঙ্গ ইসলামী হুকুমত কায়েম করা হয় তবে যাদের অক্লান্ত পরিশ্রমে ও জান জীবন বিসর্জন দেয়ার কারণে তা কায়েম হতে পারে তাদের কিভাবে পুরস্কৃত করা হবে। আর দেখালেন এর বিপরীত কাজ যারা করবে অর্থাৎ আল্লাহর ইচ্ছা মুতাবিক বা মিরাজের শিক্ষা মুতাবিক ইসলামী সমাজ যারা গড়বে না এবং যারা তা গড়বার পথে বাধা সৃষ্টি করবে তাদের শেষ পরিণতি কি হবে তাই।

তিনি যা দেখলেন ঃ-

১. তিনি দেখলেন-----একদল লোক যে দিনই যমীনে বীজ বুনছে সে দিনই সে ফসল পেকে যাচ্ছে আর বপনকারীরা তা কেটে নিচ্ছে। হুজুর (স) তাদের পরিচয় জানতে চাইলে জিব্রাইল (আ) বললেন এরা মুজাহিদ। যারা আল্লাহর দেয়া মূলনীতির ভিত্তিতে ইসলামী হুকুমত গড়ার জন্যে তাগুত ও আল্লাহদ্রোহীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছিল এরা তারাই। তারা দুনিয়া থেকে যে কাজ করে আসছে তার ফল সঙ্গে সঙ্গে পাচ্ছে।

২. তিনি চলতে চলতে খোশবু পেলেন। জিজ্ঞাসা করলেন কিসের খোশবু? জবাব হলো এ 'মাসেতা' ও তার সন্তাদের খোশবু। মাসেতা ছিলেন ফেরাউনের কন্যা। মহিয়সী মাসেতা পিতাকে অস্বীকার করে হযরত মূসা (আ)-এর আল্লার উপর ঈমান এনেছিলেন। যার ফলে তাকে ও তার সন্তানদেরকে ফুটন্ত তেলের মধ্যে ফেলে দিয়ে মেরেছিল। আল্লাহ দেখালেন যারা দ্বীনের পথে থেকে এভাবে জীবন উৎসর্গ করে তাদের বেহেশতের মধ্যে কত সম্মান। এটা দেখানোর উদ্দেশ্য এই যে দ্বীন ইসলামকে সমাজে কায়েম করতে গেলে যে কিছু লোককে মরতে হয় সে মরার ভয়ে কেউ যেন পিছপা না হয়। এই কথাটাই আল্লাহ সূরা আল মূলক (The state)-এর মধ্যে বলেছেন-

اَلَّذِىْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيٰوةَ لِيَبْلُوَكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ـ

"আল্লাহ তিনি যিনি হায়াত ও মওত সৃষ্টি করেছেন তোমাদের পরীক্ষার উদ্দেশ্যে যে (দেখা যাবে) তোমরাকে (মৃত্যুর ভয়ে ও বেঁচে থাকার লোভে নবী (স)-এর পিছন থেকে সরে দাঁড়াও আর মৃত্যুর ভয় ও বাঁচার লোভকে উপেক্ষা করে তোমাদের মধ্যে কারা) সবচাইতে ভাল কাজ করতে পারে।"

www.pathagar.com

৩. তিনি যেতে যেতে শুনতে পেলেন বেহেশত চিৎকার করে বলছে

يَارَبِّ اٰتِنِىْ بِمَا وَعَدْتَنِىْ ـ

অর্থাৎ বেহেশত বলছে "হে আল্লাহ। তুমি আমার নিকট যা দেয়ার ওয়াদা করেছ তা দাও।" ভাল লোকদেরকে আমার মধ্যে পাঠাও...ইত্যাদি। আর আল্লাহ তার জবাবে বলেছেনঃ

فَقَالَ اللّٰهُ كُلُّ مُسْلِمٍ وَمُسْلِمَةٍ وَمُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ وَمَنْ اٰمَنَ بِىْ وَبِرُسُلِىْ وَعَمِلَ صَالِحًا وَلَمْ يُشْرِكْ بِىْ شَيْئًا ـ وَلَمْ يَتَّخِذْ مِنْ دُوْنِىْ اَنْدَادًا وَمَنْ خَشِيَنِىْ فَهُوَ اٰمِنٌ وَمَنْ سَالَنِىْ اَعْطَيْتُهٗ وَمَنْ اَقْرَضَنِىْ جَزَيْتُهٗ وَمَنْ تَوَكَّلَ عَلَىَّ كَفَيْتُهٗ ـ اَللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ اِلَّا اَنَا ـ لَااُخْلِفُ الْمِيْعَادَ وَقَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ وَتَبَارَكَ اللّٰهُ اَحْسَنَ الْخَالِقِيْنَ ـ

- আল হাদিস

'অর্থাৎ আল্লাহ বলেছেন, প্রত্যেক মোমেন মুসলমান নরনারী যারা আমার ও আমার নবীর উপর ঈমান এনেছে এবং যারা সৎকর্মশীল ব্যক্তি এবং যারা আমার সঙ্গে কাউকে শরীক করেনি আর যারা কাউকে আমার অংশীদার বানায়নি হে বেহেশত, তারা তোমারই জন্যে। আর যে আমায় ভয় করবে সে শান্তিতে থাকবে। আর যে আমার নিকট প্রার্থনা করবে আমি তার প্রার্থনা মঞ্জুর করব যে আমাকে কর্জ দেবে আমি তাকে তার প্রতিদান দেব। যে আমার উপর নির্ভর করবে আমি তার জন্যে যথেষ্ট হব। আমি বিশ্বাস করি আল্লাহ ছাড়া আর কেউ মুনিব নেই। আমি ওয়াদা ভঙ্গ করি না। অবশ্যই যারা মোমেন তারা কৃতকার্য হয়েছে। মহান আল্লাহ সর্বোৎকৃষ্ট সৃষ্টিকর্তা।"

এর থেকে বুঝা গেল বেহেশতে যাওয়ার জন্যে উপরোক্ত গুণগুলো থাকা দরকার।

৪. এরপর নবী (স) দেখলেন একদল মানুষকে মাথায় পাথর মেরে চূর্ণ

www.pathagar.com

বিচূর্ণ করে দেয়া হচ্ছে। তাদের পরিচয় জানতে চাইলে হযরত জিব্রাঈল (আ) বললেন এরা ছিল নামাযে অমনোযোগী। যারাই নামাযে অমনোযোগী তারাই জীবনের সর্বক্ষেত্রে আল্লার আইন মানতে চায় না।

৫. আরেক দলকে দেখলেন ছেঁড়া টোটা ফাটা কাপড় পরে জাহান্নামের গরম পাথর চিবুচ্ছে এবং জাবর কাটছে। তাদের পরিচয় জিজ্ঞেস করলে বলা হলো এরা যাকাত অস্বীকারকারী।

৬. অপর এক দলকে দেখালেন যাদের এক পাশে ভাল গোশত ও অন্য পাশে মন্দ গোশত রয়েছে আর তারা ভাল রেখে মন্দ গোশত খাচ্ছে। তাদের পরিচয় জানলেন যে তারা সেই সব নারীপুরুষ যাদের বৈধ স্বামী স্ত্রী থাকা সত্বেও অবৈধ যৌন সম্পর্ক স্থাপন করেছে।

৭. একদলকে দেখলেন তাদের সামনে এক বোঝা কাঠ রয়েছে। সে বোঝা তারা উঠাতে পারছেন না তা সত্বেও আরও কাঠ এনে বোঝাকে ভারী বানাচ্ছে। তাদের পরিচয় নিয়ে জানলেন যে তারা আমানতে খেয়ানতকারী। এ দোষ সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের মধ্যেই বেশী।

৮. একদল লোকের ঠোঁট ও জিহ্বা কাঁচি দ্বারা কাটতে দেখে তাদের পরিচয় নিয়ে জানলেন যে এরা বিভ্রান্তি সৃষ্টিকারী বক্তা। এরা সমাজের মধ্যে ভুল ওয়াজ করে লোকদের ভুল পথে নিত। এদের কারণে লোকে মনে করত জিহাদ ছাড়া বা ইসলামী হুকুমত কায়েমের চেষ্টা ছাড়াই বেহেশতে যাওয়া যাবে।

৯. আরেক স্থানে দেখলেন পাথরের ভিতর থেকে ষাঁড় বের হচ্ছে। পরে আবার সেই পাথরের মধ্যে তা ঢুকবার জন্যে চেষ্টা করছে কিন্তু পারছে না। এদের পরিচয় নিয়ে জানলেন যে তারা আগপাছ চিন্তা না করে বড় বড় কথা বলতে পরে লজ্জিত হয়ে তা আর ফেরত নিতে পারত না।

১০. তিনি একদল লোক দেখলেন যাদের ঠোঁট উটের ঠোটের ন্যায় মোটা। তাদের মলদ্বার দিয়ে গোশত বেরিয়ে আসছিল আর সেই গোশত তাদের মুখের ভিতর দিয়ে তা খাওয়ান হচ্ছিল। তাদের পরিচয় নিয়ে জানতে পারলেন যে এরা এতিমের মাল ভক্ষণকারী।

১১. একদল মেয়েলোককে দেখলেন তাদের মাথা নিচের দিকে দিয়ে দোযখের মধ্যে ঝুলন্ত অবস্থায় রাখা হয়েছে এবং তারা আল্লাহর নাম নিয়ে

www.pathagar.com

আফসোস করছে। তাদের পরিচয় নিয়ে জানলেন যে তারা যেনাকারিনী স্ত্রীলোক। তাদের ন্যায় যেনাকারী পুরুষদেরকেও তিনি দেখছিলেন ঐভাবে আজাব ভোগ করতে।

১২. আরেক দলকে দেখলেন তাদের নিজেদের শরীর থেকে গোশত কেটে তাদেরই সামনে রাখা হচ্ছে আর বলা হচ্ছে এগুলি তেমন ভাবেই খাও যেমন ভাবে তোমাদের ভাইদের গোশত খেয়েছিলে। এদের পরিচয় জানতে পারলেন যে এরা পরনিন্দুক ও চোগলখোর।

উপসংহার

ফলকথা- পূর্বে বর্ণিত ১৪ দফা মূলনীতির যারা অস্বীকারকারী ও অমান্যকারী তাদের সব ধরনের গোনাহগারদের কার কি শাস্তি হবে তা তিনি স্বচক্ষে দেখে আসলেন।

আর শুনলেন দোযখ থেকে ভেসে আসা আওয়াজ। দোযখ আল্লাহকে বলছে يَارَبِّ اٰتِنِىْ بِمَا وَعَدْتَّنِىْ (ইয়া রাব্বি আতেনী বিমা ওয়াত্তানি) অর্থাৎ হে আল্লাহ । যাদেরকে আমার মধ্যে দেয়ার ওয়াদা করেছো তাদেরকে আমার মধ্যে দাও। আমার ভিতরকার শাস্তি, গরম পানি, বিষাক্ত কাঁটা, পুজ, রক্ত, উত্তপ্ততা ও গভীরতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। আল্লাহ তুমি গোনাহগারদের দাও। তাদের দিয়ে আমার উদর পূর্তি করি।

অতঃপর আল্লাহ দোযখকে বলেছেন–

قَالَ لَكِ كُلُّ مُشْرِكٍ وَمُشْرِكَةٍ وَكَافِرٍ وَكَافِرَةٍ خَبِيْثٍ وَخَبِيْثَةٍ وَكُلُّ جَبَّارٍ لَايُؤْمِنُوْنَ يَوْمَ الْحِسَابِ ـ

"আল্লাহ বলেছেন হে দোযখ! তারাই তোমাদের মধ্যে যাবে বা তাদেরকেই তোমাদের জন্যে নির্দিষ্ট করে রেখেছি, যারা মুশরিক, কাফের, চরিত্রহীন, অবাধ্য এবং পরকালের উপর আস্থাহীন।"

উপরে যে সব দুষ্টদের কথা বলা হলো এরা যে মুসলমান জাতির বাইরের লোক: তা নয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক লোক রয়েছে মুসলমান। যাদের কথা সূরা আল-মুলকের মধ্যে আল্লাহ পাক বলেছেন اَلَمْ يَأْتِكُمْ نَذِيْرٌ (আলাম ইয়াতিকুম নাযিরুন)" তোমাদের নিকট কি কোন

www.pathagar.com

ভয় প্রদর্শনকারী যায়নি।" এ কথা দোযখের ফেরেশতারা জিজ্ঞাসা করলে তার জবাবে দোযখীরা যারা আহলে কিতাব ছিল এবং যাদের মধ্যে মুসলমান ছিল তারা বলবে–

قَالُوْا بَلٰى قَدْ جَاءَ نَا نَذِيْرٌ * فَكَذَّبْنَا وَقُلْنَا مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَيْءٍ صلى اِنْ اَنْتُمْ اِلَّا فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ * وَقَالُوْا لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ *

"তারা বলবে, অবশ্যই আমাদের নিকট ভয় প্রদর্শনকারী (হেদায়েতকারী) এসেছিলেন, আমরা তাদের কথা মিথ্যা মনে করতাম। আমরা বলতাম যে আল্লাহ ঐ সব কথা (সমাজে পূর্ণ ইসলাম কায়েম করার কথা) কুরআন পাকে নাযিল করেন নি। আর ওসব কথা যারা বলত আমরা তাদেরকে বলতাম যে তোমরা আস্ত গোমরাহির মধ্যে রয়েছে এবং তারা আরও বলবে, যদি আমরা তাদের কথা শুনতাম কিংবা বুঝতাম তা হলে আজ আমরা দোযখবাসী হতাম না।

এ কথার ব্যাখ্যা করলেও বুঝা যায় যে এ ধরনের কথা বলা লোক অন্য কোন সম্প্রদায়ের মধ্যে নয় বরং এ হচ্ছে আহলে কিতাব তথা এক ধরনের মুসলমানদেরই কথা যারা মি'রাজের মূল শিক্ষার ভিত্তিতে সমাজ তথা রাষ্ট্র কায়েম করার কোন গুরুত্বই দেয় না। বরং তারা বলে যে ইসলামে রাজনীতি নেই। তারা বলে ওসব কথা আল্লাহ কুরআনে বলেননি যারা ওসব রাজনীতির কথা বলে তারা فِىْ ضَلٰلٍ كَبِيْرٍ শক্ত গোমরাহির মধ্যে রয়েছে।

আফসোস! যে এসব লোক মনে প্রাণে ইসলাম ভক্ত কিন্তু আল-কুরআনের শিক্ষা ছাড়াই তারা ঈমানদার। ফলে আল্লাহ কি বলেছেন তার খোঁজ খবর না রেখেই বলে যে مَا نَزَّلَ اللّٰهُ مِنْ شَىْءٍ আল্লাহ ঐ ধরনের কিছু কুরআনে নাযিল করেন নি। অন্য কোন অপরাধ নয় বরং এই অপরাধেই তারা শেষ পর্যন্ত দোযখে পৌছে গিয়ে বলবে যে হায় আল্লাহ!

لَوْ كُنَّا نَسْمَعُ اَوْ نَعْقِلُ مَا كُنَّا فِىْ اَصْحٰبِ السَّعِيْرِ .

www.pathagar.com

"যদি আমরা শুনতাম অথবা বুঝতাম তাহলে আজ আমরা দোযখবাসী হতাম না।"

আমাদের সমাজে কিছু লোক দেখা যায় তারা অত্যন্ত আল্লাহভক্ত ও ইসলাম প্রিয়। কিন্তু সমাজের প্রতিটি স্তরে আল্লার বিধান কায়েম করার জন্য সংগ্রাম করাকে তারা নাজায়েয মনে করেন। অথচ তারা ভালই জানেন যে এই সংগ্রাম করেই নবী (স)-এর জীবনটা শেষ হয়েছিল।

মিরাজের মূলনীতির ভিত্তিতে হুকুমত কায়েম না হওয়া পর্যন্ত যে পুরা ইসলাম মেনে চলা যায় না এবং সমাজ থেকে অন্যায় অত্যাচার জোর জুলুম উঠে যায় না তা অত্যন্ত পরিষ্কার ভাষায় আল্লাহ বলেছেন ১৮ পারায় সূরা নূরের ৫৫নং আয়াতের মধ্যে। এখানে আল্লাহ عِبَادِ اللّٰهِ الصّٰلِحِيْنَ (ইবাদিল্লাহিস সালিহীন) দের খেলাফতি দান করবেন বলে ওয়াদা করেছেন– যা এই বইয়ের ২০ পৃষ্ঠায় আলোচনা করা হয়েছে।

এ দীর্ঘ আলোচনা থেকে বুঝা গেল যে মিরাজের ঘটনাবলী প্রকৃতপক্ষে নবীজীবনের মুল উদ্দেশ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ ছিল এবং মিরাজের যা শিক্ষা তা আমাদের ইহকালেরও মুক্তি সনদ-পরকালেরও মুক্তি সনদ।

কতই না ভাল হত যদি এ সব কথা আমরা বুঝতাম এবং সে মুতাবিক সমাজ গড়তাম। আমি আশা করি এখন থেকে আমরা নিরপেক্ষ মন নিয়ে এ মিরাজের নিগুড়তত্ব বুঝার চেষ্টা করব।

ওয়ামা তৌফিকী ইল্লা বিল্লাহ

সমাপ্ত

www.pathagar.com

খন্দকার আবুল খায়ের (র.) বইসমূহ

১. সূরা ফাতেহার মৌলিক শিক্ষা
২. আয়াতুল কুরসীর তাৎপর্য
৩. দ্বীন প্রতিষ্ঠার ধারা
৪. প্রথম মানুষই প্রথম বিজ্ঞানী
৫. কুরবাণীর শিক্ষা
৬. ঈমানের দাবী মু'মিনের পরিচয়
৭. কেসাস অসিয়ত রোজা
৮. অর্থনীতিতে ইসলামের ভূমিকা
৯. ইসলামী দণ্ডবিধি
১০. মি'রাজের তাৎপর্য
১১. পর্দার গুরুত্ব
১২. বান্দার হক
১৩. ইসলামী জীবন দর্শন
১৪. মহাশূণ্যে সবই ঘুরছে
১৫. নাজাতের সঠিক পথ
১৬. ইসলামের রাজদণ্ড
১৭. যুক্তির কষ্টিপাথরে আল্লাহর অস্তিত্ব
১৮. রাসুলুল্লাহ (স.) বিদায়ী ভাষণ
১৯. সূরা ইখলাসের হাকিকত
২০. প্রাকৃতিক দুর্যোগ
২১. মুসলিম ঐক্যের গুরুত্ব
২২-২৩. ইনফাক ও জিহাদ ফিসাবিলিল্লাহ্
২৪. নামাজের মৌলিক শিক্ষা
২৫. রোজার মৌলিক শিক্ষা
২৬. সুরা কাউসারের মৌলিক শিক্ষা
২৭. ভোট দেব কাকে এবং কেন?
২৮. ইসলামী আইনে কার কি লাভ ক্ষতি?
২৯. শহীদে কারবালা
৩০. সূরা ফালাক ও নাসের মৌলিক শিক্ষা
৩১. সূরা তাকাছুর ও আসরের মৌলিক শিক্ষা
৩২. নারী নেতৃত্বের চলতি ধারা
৩৩. শয়তান পরিচিতি
৩৪. নাগরিকত্ব হরণের পরিনতি
৩৫. দেশ রক্ষা বাহিনীর গুরুত্ব
৩৬. সূরা মূলকের মৌলিক শিক্ষা
৩৭. সূরা ক্বদরের মৌলিক শিক্ষা
৩৮. যুক্তির কষ্টিপাথরে পরকাল
৩৯. রব মালিক ইলাহ্ হিসেবে আল্লাহর পরিচয়
৪০. কোরআনই বিজ্ঞানের উৎস
৪১. আল্লাহর দৃষ্টিতে কে ঈমানদার কে মুশরিক
৪২. ইল্‌ম গোপনের পরিণতি
৪৩. সওয়াল জওয়াব (১-৯)
৪৪. বিভ্রান্তির ঘূর্ণাবর্তে মুসলমান
৪৫. প্রশ্নোত্তরে কুরআন পরিচিতি
৪৬. অমুসলিমদের প্রতি মহাসত্যের ডাক
৪৭. সহীহ্ কুরআন শিক্ষা পদ্ধতি
৪৮. প্রচলিত জাল হাদীস
৪৯. বাংলাদেশে ইসলাম মৌকিম না মুসাফির
৫০. যুক্তির কষ্টিপাথরে মিয়ারে হক
৫১. ইসলামই বাংলাদেশের মেন্ডেটরির জাতীয় আদর্শ

খন্দকার প্রকাশনী
পাঠক বন্ধু মার্কেট
৫০ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০
মোবাইল: ০১৭১১ ৯৬৬২২৯
০১৯২৪ ৭৩৩৮১৫